আসুন, প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে জানি



বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার সংজ্ঞায় মোট ৫ ধরণের সেবার কথা উল্লেখ করেছে - উন্নয়নমূলক, প্রতিরোধ, প্রতিকার, পূনর্বাসন এবং প্যালিয়েটিভ। যার মধ্যে প্রথম চারটি সবার খুব পরিচিত হলেও প্যালিয়েটিভ সেবাটি এখনো অনেকের কাছেই নূতন। প্যালিয়েটিভ কেয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষায়িত শাখা যা রোগী কেন্দ্রিক, রোগ কেন্দ্রিক নয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ার কঠিন নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবনের মান বাড়ায়।

ডা. ফারজানা খান

আসুন, প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে জানি

ডাঃ ফারজানা খান

আইএসবিএন নং ঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৫২৫২-৮

আসুন, প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে জানি

ডাঃ ফারজানা খান
প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট
ফসিউদ্দীন খান রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বাড়ী-২৮, সড়ক-৭/সি, সেক্টর-৯
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

প্রকাশকাল ঃ ২০১৮ ইং

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

মুদ্রণ
এশিয়ান কালার প্রিন্টিং
১৩০, রাজউক বর্দ্ধিত সড়ক
(ফকিরেরপুল), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪৯৩৫৭৭২৬, ৫৮৩১৩১৮৬

উৎসর্গ

আমার আব্বা, ফসিউদ্দিন খান এবং আম্মা, বেগম শামসুন্নাহার খানকে,
যাদের আত্মবিশ্বাস এবং সাহস, আমার রক্তে প্রবাহিত হয়ে
গর্বিত করে আমাকে প্রতি মুহূর্তে

কৃতজ্ঞতাঃ

আলাদা করে নাম লিখতে গেলে এমন আরেকটি বই লাগবে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন এই বইটি লিখতে ও প্রকাশ করতে। বরং একটু ঘুরিয়ে যদি বলি, এই জীবনে যাদের সাথে আমার সংযোগ ঘটেছে সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও উষ্ণ কৃতজ্ঞতা। যাদের আচরণে মনে হয়েছে "জীবনটা ফুলশয্যা না," তাদের প্রতি দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতা। কারণ তারা আমার সাহস আর আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলেছেন নানাভাবে ক্রমান্বয়ে। আর যারা আমার ছোট্ট জীবনকে "বহতা নদীর মত" অনুভব করতে সাহায্য করেছেন, আমার বিশ্বাস শুধু এ জীবনে না পরকালেও দেখা হবে সবার সাথে, শতবার, নাহ লক্ষ-কোটিবার.....

শুরুর কথা

১৭ই অক্টোবর, ১৯৭৯ সাল। "আমার মুখে বরফ দাও, আমার জিভে বরফের টুকরা রাখো", তীব্র পিঠের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আব্বা বার বার হাসপাতাল কক্ষে উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করছিলেন। "বরফ দিলে ব্যথা একটু কম বোধ হয়।" ফুসফুসের শেষ পর্যায়ের রোগ নিয়ে ঢাকায় একটি টারশিয়ারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। প্রথম দুদিন পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিলে ব্যথা কমায় আব্বা একটু ঘুমাতে পেরেছিলেন। তৃতীয় দিন ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ায় আবার শুরু হল তীব্র কুকড়ে যাওয়া ব্যথা। কিন্তু ডাক্তার বললেন উনাকে আর পেথিডিন দেওয়া যাবে না, কারণ উনার মাদকাসক্তি হয়ে যাবে। দূর-দূরান্তের আত্মীয় স্বজন অনেকেই আব্বাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছেন। উপস্থিত কেউ বরফ দিচ্ছিলেন না। বরফ আনতে লোক পাঠিয়েছি, এই এসে পরেছে ইত্যাদি মিথ্যাচার চলছিলো কারণ আব্বার গলার আওয়াজ এমনিতেই শোনা যাচ্ছিলো না। আরো ক্ষতির সম্ভাবনার ভয়ে কেউ আব্বার কথা পাত্তা দিচ্ছিল না। সেই রাত্রেই আব্বা মারা গেলেন তীব্র ব্যথা নিয়ে।

আজ ১৭ই অক্টোবর ২০১৮ সাল। ঊনচল্লিশ বছর পর বর্তমানে এই পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হয়েছে তা প্রশ্নবোধক। প্রথম কারনটি হলো আমি নিজে এই কাজটির সাথে জড়িত। দ্বিতীয় কারণটি হলো একটি গবেষণানির্ভর প্রমান। ২০১৪ সালে নিপোর্ট- বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবস্থান নিরূপণ বিষয়ে একটি গবেষণা করে। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে যেকোন সময়ে ৬ লক্ষ মানুষের প্যালিয়েটিভ কেয়ার দরকার। শতকরা ৭০ জন ক্যান্সার রোগী মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় ভোগেন। অথচ বাংলাদেশে শতকরা ৯৮ ভাগ ডাক্তার এবং নার্সদের প্যালিয়েটিভ কেয়ারের উপর কোন প্রশিক্ষণ নেই। এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মাত্র ৮/৯ টি প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার সংজ্ঞায় মোট ৫ ধরণের সেবার কথা উল্লেখ করেছে - উন্নয়নমূলক, প্রতিরোধ, প্রতিকার, পূনর্বাসন এবং প্যালিয়েটিভ। যার মধ্যে প্রথম চারটি সবার খুব পরিচিত হলেও প্যালিয়েটিভ সেবাটি এখনো অনেকের কাছেই নূতন। প্যালিয়েটিভ কেয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষায়িত শাখা যা রোগী কেন্দ্রিক, রোগ কেন্দ্রিক নয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ার কঠিন নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবনের মান বাড়ায়।

এ মুর্হূতে পৃথিবীতে যতো মানুষের প্যালিয়েটিভ কেয়ার দরকার তাদের মধ্যে মাত্র ১৪ শতাংশ এ সেবাটি পেয়ে থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসেবে জানা যায় যে প্রতি বৎসর মোট চার কোটি মানুষরে জীবনের শেষ সময়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার রাখতে পারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। আরোগ্য অযোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণা কমানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সেবা দেয়ার প্রক্রিয়াকেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলা হয়।

ক্রমর্বধমান ক্যান্সার ও অন্যান্য অসংক্রামক রোগ, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। ওষুধের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আরেক হিসেবে জানা যায় যে প্রতি বৎসর স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে গিয়ে মোট সাড়ে ৫২ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ছে আর বড় ধরনের আকস্মিক স্বাস্থ্য ব্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে সোয়া দুই কোটি মানুষ। কঠিন রোগাক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারকে প্রায়ই আর্থিক বিপর্যয়ে পড়তে হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত স্বাস্থ্য ব্যয়ের কারণে সর্বস্বান্ত হতে হয়। ২০১৫ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্যে জানা যায়, স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে জনপ্রতি ১০০ টাকা খরচের মধ্যে ৬৭ টাকা মানুষের নিজের পকেট থেকে যায়। আমাদের উচিত বিষয়টি প্যালিয়েটিভ কেয়ারের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা এবং তার প্রতিকার খুঁজে বের করা।

জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন রয়েছে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ। শুধু সুবিধাভোগীর হার নয়, সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দের দিক থেকেও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এ কর্মসূচীগুলো প্রদানের ক্ষেত্রে মূলত ভাবা হয় দরিদ্র শ্রেনীর কথা। কিন্তু জীবন সংশয়ী একটি রোগে আক্রান্ত মানুষ কত দ্রুত অসহায়, পূজিহীন হয়ে পড়েন, সূচনায় রহিম সাহেবের ঘটনাটি তার বাস্তব প্রমাণ।

পেশাগত রূপ যাই হোক না কেন, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একজন রোগীও। নিজেকে রোগী বা রোগীর আত্মীয় স্বরূপে যখন আমরা পাই, তখন আমরা বুঝি যত্ন কখন মমতার সাথে দেয়া হয় আর কখন এর ব্যতিক্রম। তাহলে কি করা যায়? আমরা মমতা, যত্ন এবং র্মযাদা দিতে শুরু করতে পারি। অস্বীকার করা অসম্ভব যে, মমতা শক্তির কেন্দ্রবিন্দু।

আসলে প্রতিরোধ ও আরোগ্য কখনোই শেষ কথা নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা সর্মথন করে না বলেই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের উদ্ভাবন। তীব্র ব্যথায় ব্যবহৃত মরফিন বাংলাদেশ জাতীয় জরুরী ঔষধের তালিকার অর্ন্তভুক্ত। কিন্তু মরফিন সব জায়গায় পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র ঢাকায় কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রি হয়। এরকম হলে প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিশ্চিত করা দুষ্কর। মরফিনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে অবশ্যই। কিন্তু এটা যেন রোগীদের জন্য সহজপ্রাপ্য করা হয়। বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানের ওষুধ উৎপাদন করে। স্থানীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ নিজস্ব উৎপাদিত ওষুধের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। আমেরিকা, ইউরোপসহ ১২৭টি দেশে বাংলাদেশ ওষুধ রপ্তানি করছে। ইতিমধ্যেই একটি ওষুধ কোম্পানী প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ডাকে সাড়া দিয়ে immediate release morphine তৈরী করছেন। আর কোন ওষুধ কোম্পানি কি একই জাতীয় দামি ওষুধের পরিবর্তে আরো কম দামে মরফিন প্রস্তুত করতে পারেন? প্রয়োজনে সরকারের এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানির মাধ্যমে মরফিন উৎপাদন ও বিতরণ নিশ্চিত করা যেতে পারে কি?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা এই বই থেকে জানতে পারবো। আমরা একসাথে কাজ করলে কঠিন রোগীদের সেবা সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধিকে হয়তো অতিক্রম করতে পারবো, আর নিরাময়অযোগ্য রোগীদের সেবায় আমাদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সেবার মান বাড়াতে পারবো। আশা করি এই বইটি সে চেষ্টা পূরণ করতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। এ বইতে সংকলিত সব তথ্য ও উপাদান একটি দিক নির্দেশ করে। আর এক কথায় তা হল প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিস্থিতি উন্নয়নে বাস্তবতার নিরিখে সব উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে একটি যথার্থ কর্ম পরিকল্পনা করা ও নিবিড়ভাবে তা পালন করা। আর যতদিন তা পূরণ না হয় ততদিন কঠিন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা। আরো একটি দিক দেখা দরকার তা হল রোগী ও পরিবারকে এমন একটি জীবন যাপনে সাহায্য করা যা একান্তই অর্থবহ।

নিরাময়অযোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের সমাজেরই অংশ। স্বাস্থ্য বিষয়ক আমাদের সকল উন্নয়ন র্কমকান্ডে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকগণ ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার সহকর্মীবৃন্দসহ সকলকে একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল জীবন সংশয়ী রোগে আক্রান্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারের জীবন কষ্ট মুক্ত হোক - এ প্রত্যাশা করছি।

আসুন,
প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে জানি

সূচীপত্র

সূচনা	৩
প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিচিতি	৯
শারিরীক সেবা	২৩
মানসিক সেবা	৩১
সামাজিক সেবা	৫৩
আত্মীক সেবা	৬১
বিশ্ব প্রেক্ষাপট	৬৭
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	৭১
যোগাযোগ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ	৮১
গৃহসেবা	৯১
দারিদ্র বিমোচন এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার	৯৯
টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ভূমিকা	১০৩
সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার	১০৯
মৃত্যু নিয়ে কিছু কথা	১১৫

"নিজের আত্মমর্যাদা ধরে রাখার জন্য সারাজীবন আপনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, মৃত্যুর সময়ে আপনার হয়ে অন্যরা সেটুকু করুক।"

- বোনো

সূচনা

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে কি প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান যুক্তিযুক্ত কিনা। প্রশ্নের উত্তরটি দেব শেষে। আগে বাংলাদেশি একজন মানুষ যিনি প্যালিয়েটিভ কেয়ার পেয়েছেন এই বাংলাদেশে বসেই, তার গল্পটি বলে লেখাটা শুরু করি।

রহিম সাহেব (ছদ্ম নাম) সরকারী উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা। রিটায়ার করার সময় বেশ কিছু টাকা একসাথে পেলেন। যখন অবসর জীবনটা কিভাবে উপভোগ করা যায় এমন কথা ভাবছিলেন, ঠিক তখনই পেটের উপরের ডান দিকে ব্যথা শুরু হল। ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলো। প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর বোঝা গেলো রোগ সুবিধার নয় - ক্যান্সার -- লিভার ক্যান্সার। প্রথমে শুনলেন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করলে তিনি একদম ভালো হয়ে যাবেন। পরিবারের সবাই মিলে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখলেন মেধান্তা, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ইনিষ্টিটিউট, দিল্লী - সাউথ এশিয়ার মধ্যে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর জন্য অনেক ভাল। তারা তখন চিন্তা করে দেখলেন যে এর জন্য নিশ্চয়ই অনেক টাকা দরকার। ইমেইলে যোগাযোগ করে জানলেন প্রায় ৭০ লাখ টাকা লাগতে পারে এবং ডোনার হতে হবে ব্লাড কানেক্টেড। রহিম সাহেবের দুই সন্তান। ছেলে বিদেশে পড়াশুনা করে, যার রক্তের সাথে তার রক্ত খাপ খায়। তিনি ভাবলেন, আমি রিটায়ার করেছি, ইনশাল্লাহ আমার যে দায়-দায়িত্ব ছিল মোটামুটি শেষ, এখন মেয়ে বিয়ে দিয়েছি, ছেলেটাকেও মোটামুটি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি তাই আমি এ মুহূর্তে তাদের কোন ঝামেলা করতে চাইনা।

পরিচিত সবার সাথে কথা বলে তিনি দিল্লিতে চিকিৎসা নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। দিল্লিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর জানলেন যে, যেহেতু তার লিভারে একটা টিউমার আছে এবং তিনি ক্রনিক হেপাটাইটিসে আক্রান্ত, এটি আর পুরোপুরি ভালো হবে না। প্রায় ৩০ লাখ টাকার ভেতর চিকিৎসার একটি ধারণা তাকে দেয়া হল। চলুন বাকি ঘটনা তার নিজের ভাষায় শুনি।

আমি তাদের বললাম, দেখ চিকিৎসায় যদি আমার মোটামুটি কিউর হয় তবে তাই কর, এখন আর ১০০% কিউর চাই না। কারন আমি এই রিস্ক নিতে পারব না।

প্রায় ২০ লাখ টাকার মত নিয়ে গেলাম। যাওয়ার পরে ওরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। আর সেই মেধান্তাতেই আমার লিভার অপারেশন হয়। তারা বলেছিল ট্রিটমেন্টের সব কিছুই নির্ভর করে উপরওয়ালার কাছে, আমরা এটা বলতে পারবো না যে শতভাগ কিউর হবে। সার্জারি করার ২ দিন পর বা ২ বছর পর বা ১০ বছর পর এটি ফিরে আসতে পারে। ফলোআপ এর উপর থাকতে হবে। কিন্তু ফলোআপ এর জন্য যে টেস্ট দিল সেই টেস্ট তো এই দেশে সুলভ না; প্রাইভেটে খোঁজ নিলাম তারা ৬৫ হাজার টাকা নেবে। রিটায়ার্ড লাইফ এত টাকা খরচ করলাম, এখন এত টাকা দিয়ে টেস্ট করাবো কিভাবে! পরে ফলোআপটা যথাযথ ভাবে করা হয়নি।

আমি চিন্তা করলাম আমার টাকাতো এদিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার যে বাকি ১০-১২ লাখ টাকা আছে সেটা দিয়ে আমি হজ্বে যাব, আমার স্ত্রীকে নিয়ে। আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহ কে বিশ্বাস করি। ধর্মের কাজটা করে আসবো। তখন আবার পেটের ডান দিকের চামড়ার উপরে একটা ছোট টিউমারের মত দেখা গেল। এটা কিছুই না, আমি এটাকে গুরুত্বই দিলাম না, ভাবতে পারিনি যে এটার সাথে লিভারের কোন যোগাযোগ থাকতে পারে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলল তুমি যদি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে যাও, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখ যে এটা খারাপ অবস্থার দিকে যাচ্ছে তাহলে তুমি কি করবে? তখন তোমাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে এবং তোমার হাতের সব টাকা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এবং তোমার হজ্ব হবে না। তুমি নিজে ভেবে সিদ্ধান্ত নাও।

তখন আমি চিন্তা করলাম যে, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, আমার হাতে যে টাকা আছে, ওটা দিয়ে আমি হজ্বে যাব তারপর যা হবার হবে। যেহেতু আমরা মুসলিম, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সব কিছুর মালিক, হায়াত আল্লাহর হাতে। আমরা ২০১৫ তে হজ্বে গেলাম।

কিছুদিন পর টিউমারটা ধীরে ধীরে বেশ বড় হয়ে আসতে লাগলো। যেটুক টাকা ছিল তা নিয়ে আমি আবার দিল্লিতে গেলাম। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওরা বলল, লিভারের পাশেও আরও ছোট ছোট অনেক টিউমার দেখা যায়। ফুসফুসের পাশেও দেখা দিচ্ছে। ওরা বলল এটা বায়োপসি করে দেখতে হবে যে, এটা ক্যান্সার কিনা। তখন ওরা টিউমার থেকে মাংস কেটে নিল, পরীক্ষা করার জন্যে কিন্তু ওটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি বাংলাদেশে যেটা করেছিলাম সেখানে সিরিঞ্জ দিয়ে

ভিতরে থেকে নিয়েছিল। তখন আমি বললাম তোমরা যে কেটে নিলে অ্যান্টিবায়োটিক দাও, উনারা বলে দিলেন লাগবে না। আরও বললেন, তোমার এখন একটাই ট্রিটমেন্ট সরাফেনিক। সরাফেনিক ইনজেকশন যেটা আছে সেটা দেয়া যাবে না। সরাফেনিক ট্যাবলেট তোমাকে দিলাম এটা যদি দিনে চারটা করে বডিতে এডজাস্ট করাতে পার তাহলে মোটামুটি কাজ করবে। সেই সরাফেনিক খাওয়া শুরু করলাম। দুইটার বেশি খেতে পারিনা। খেলে পা ফুলে যায়। পুজ আসে, মুখে ঘা হয়। সাইড এফেক্ট হয়। তখন শুনলাম টাটা তে নাকি ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ভাল হয় । তারপর আমি টাটা তে গেলাম। ওরা বলল সরাফেনিক খেয়ে যদি কাজ হয় তো হল আর না হলে আমাদের কাছে এর চেয়ে ভাল ট্রিটমেন্ট আছে বলে মনে হয়না। তখন আমি বললাম যে প্লিজ ক্লোজ দ্যা ফাইল এন্ড হ্যান্ডওভার ইট। তারা ফাইল আমাকে ক্লোজ করে দিয়ে দিল। চলে আসলাম।

কিছুদিন পর আমি আমার মেয়ের বাসায় যাচ্ছিলাম, ব্লাড টেস্ট করাব। দেখি যেখানে ইনফেকশন ছিল ওখানে ব্লাড আসছে। টিউমারটা বড় হয়ে গেছে, চাপ লেগেছে তাই রক্ত বের হচ্ছে। হতাশ হয়ে গেলাম কিন্তু কোন ডাক্তারের সাথে তো কথা বলা দরকার। তখন অনকোলজির এক প্রফেসরের কাছে গেলাম। উনি বললেন, মুরব্বি আপনি তো দিল্লি গেছেন, মুম্বাই গেছেন আপনি তো আপনার অবস্থা বুঝেনই। আমি বলি যে, জ্বি, ধারণা আছে আমার রোগ সম্পর্কে। এটাকে ট্রিটমেন্ট করে ভাল করে দেব এমন কিছু আর আমাদের কাছে নেই। যেন আর কোন জটিলতা না হয় বা এটাকে ফলো আপ বা বেটার টেক কেয়ার করার জন্য আপনাকে একটি প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টারে পাঠাবো।

মন আগের থেকে অনেক শক্ত হয়ে গেছে। হজ্ব করে এসেছি। এবং আমি যখন অপারেশনে যাই তখন আত্মীয় স্বজনের ধারণা ছিল আমি বোধ হয় আর ফিরব না। সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা যে আল্লাহ্ আমাকে সেখান থেকে অপারেশন করানোর সামর্থ্য দিয়েছেন এবং এই যে আল্লাহ এই তিনটা বছর দিলেন - ইনকমপ্লিট যে কাজ ছিল মেইনলি আমি হজ্ব করতে পেরেছি, এখন আমার বৃদ্ধা মা আছেন তার আমি সেবা যত্ন করতে পারছি। এর জন্য আমি আল্লার কাছে শোকরিয়া আদায় করি।

আমি অন সার্ভিস থাকা অবস্থায় একদিন পেপারে এই নিয়ে পড়েছিলাম, যে বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার নামে নূতন সার্ভিস শুরু হয়েছে। যারা অসুস্থ এবং

দরিদ্র যারা ট্রিটমেন্ট করাতে পারছেন না, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি সেটা পড়েই বুঝতে পারলাম এটা খুবই ভাল উদ্যোগ। এবং যারা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই, তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। কারন সবাই যে টাকা খরচ করে হাসপাতালে গিয়ে এমন ট্রিটমেন্ট করতে পারবে এমন অবস্থা অনেকেরই নাই। আমি প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট শুরু করি। ডে বাই ডে ব্লিডিং বেড়ে গেছে এবং টিউমারটাও বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। তারপর থেকে ড্রেসিং হচ্ছে বাসায় হোম কেয়ার টিমের মাধ্যমে। তারা সপ্তাহে একদিন করে আসছেন, সেবা দিচ্ছেন। আমার আত্মীয়রা অনেক ব্যস্ত, তাদের ব্যবসা বানিজ্য আছে, বাচ্চাদের স্কুল আছে।

আমি সব সময়ের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার সার্ভিসের প্রতি কৃতজ্ঞ। এইটুকু সেবা যদি আমি না পেতাম তাহলে আমার জীবন সত্যি দুর্বিসহ হয়ে উঠতো। হায়াত মউত আল্লাহ্‌র হাতে, দুই দিন আগে বা পরে যাবো তারপরেও এই যে তারা টেক কেয়ার করছেন আসছেন যাচ্ছেন বিশেষ করে যারা হোম কেয়ার দিতে আসেন, ডাক্তারদের যতবার যখন ফোন করেছি ওনারা অনেক আন্তরিকতার সাথে সব কিছুর সমাধান দিয়েছেন। তারা সব সময় আমাকে ফোন করে আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন।" ভদ্রলোক দুই মাস পরে ইন্তেকাল করেন।

কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হলে শুধু গরিব নয়, সমাজের উচ্চবিত্তরাও যে প্রায় একই ধরণের অসহায়ত্বে ভোগেন, সেটি ভাবতে ও বুঝতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই কেস স্টাডিটি বিবৃত করা হলো। বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরনের রোগীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাই প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাংলাদেশের জন্য কোন বিলাসবহুল চিকিৎসা প্রাপ্তি নয়, নিতান্তই অপরিহার্য একটি সেবা।

সারাদেশে জীবন সীমিতকারী রোগে আক্রান্ত সকল রোগীদের কাছে প্যালিয়েটিভ কেয়ার পৌঁছে দেবার জন্য চিকিৎসক, নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং সর্বোপরি গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সবার মধ্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সারা দেশব্যাপি এটি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। আমি আসলেই বিশ্বাস করি যে আমরা বাংলাদেশীরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারি। প্রশ্ন হল, আমরা কি ইচ্ছা করবো?

পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটি-ই ভাল আছে, জ্ঞান। আর একটি-ই খারাপ আছে, অজ্ঞতা।

- সক্রেটিস

প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিচিতি

প্যালিয়েটিভ কেয়ার কেন দরকার?

প্যালিয়েটিভ কয়ারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে নীচে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হলো-

 # দি ল্যানসেট কমিশনের ২০১৭ রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ব প্রেক্ষিত (www.thelancet.com/commissions/palliative-care)

সারা বিশ্বে সপ্তাহে এক মিলিয়নের বেশী মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে, যার মধ্যে ৮০ ভাগ মৃত্যু হয় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশসমূহে। বৎসরে ৬১.১ মিলিয়ন মানুষের প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন, যার মধ্যে ৫.৩ মিলিয়ন শিশু। এর মাঝে শতকরা ১০ ভাগের কম মানুষের প্যালিয়েটিভ কেয়ারের চাহিদা মেটে এবং কমপক্ষে ১৮ মিলিয়ন মানুষ ব্যথা নিয়ে মারা যায়। ২৫.৬ মিলিয়ন রোগীর অন্তিম সেবা দরকার যার মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ অন্তিমকালে প্যালিয়েটিভ কেয়ার পেয়ে থাকে। একটি পরিবারে অন্ততঃ ২-৪ জনের প্যালিয়েটিভ কেয়ার লাগে। অথচ মাত্র ৮% দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ভাল সমন্বয় রয়েছে এবং শতকরা ৭৫ ভাগ দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের উপস্থিতি নাই বা অত্যন্ত সীমিত আকারে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মাত্র ১৭% মানুষ ৯২% মরফিন ব্যবহার করে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার একটি অত্যাবশ্যক এবং জরুরী স্বাস্থ্যসেবা

প্যালিয়েটিভ কেয়ার সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার একটি অত্যাবশ্যক এবং জরুরী স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে স্বীকৃত। এর প্রধান দুটি উপাদানঃ প্রত্যেক নাগরিক স্বাস্থ্যসেবার পূর্ণ সুযোগ পাবেন, যার মধ্যে থাকছে উন্নয়ন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং প্যালিয়েটভ বা প্রশমন সেবা ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত সকলের জন্য অর্থনৈতিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যেন চিকিৎসার নিতে গিয়ে ব্যক্তি বা পরিবার আর্থিক সংকটের মুখোমুখি না হন।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি সম্পূর্ণ সেবা

স্বাস্থ্যকর্মীগণ যখন রোগীদেরকে শারীরিক কোন সাহায্য করতে পারেন না, তখন তারা একধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন। অথচ সম্পূর্ণ সেবা পাওয়া একজন

রোগীর মানবাধিকার। কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্য-এর সংজ্ঞা অনুযায়ীঃ স্বাস্থ্য বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন মানুষ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ ভাল থাকবেন, শুধুমাত্র রোগ বা শারীরিক অক্ষমতা না থাকা নয়। সে অর্থে প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি সম্পূর্ণ সেবা।

পাঁচটি বিষয় সম্পূর্ণ সেবার অংশঃ

- জীবন-সংশয়ী বা জীবন সীমিতকারী অসুখে আক্রান্ত সব রোগীর জন্য
- সব বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
- চিকিৎসার মাধ্যমে দেয়া হয়
- রোগীকে সর্বোচ্চ কার্যক্ষম রাখার ব্যাপাওে প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল সবসময় সচেষ্ট থাকে
- এটি পুনর্বাসনে সাহায্য করে

প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি বিজ্ঞানসম্মত বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থা

২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসেচুয়েটস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক টেমেল এবং তার দল একটি গবেষণা সম্পূর্ণ করেন যা নিউ ইংল্যান্ড জর্ণালে প্রকাশিত হয়। Randomized Clinical Trial এর মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয় শেষ পর্যায়ের ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত দেশী দুটি দল নিয়ে। রোগীদের একটি গ্রুপকে ফুসফুস ক্যান্সারের নির্দিষ্ট চিকিৎসার পাশাপাশি শুরু থেকেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় গ্রুপকে শুধু ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসা দেয়া হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে চলে গবেষণাটি। পরবর্তীতে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে প্রথম গ্রুপের রোগীদের-

- জীবনের মান রোগী ছিল যা FACT-L স্কেল দিয়ে মাপা হয়েছিল।
- তাদের বিষন্নতা কম ছিল
- তারা অহেতুক অযাচিত আগ্রাসী চিকিৎসা কম পেয়েছেন
- তারা বেঁচেছেন বেশীদিন (১১.৬ মাস বনাম ৮.৯ মাস)

পৃথিবীতে জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ ঘটছে, তা যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিত্য নূতন গবেষণার ফলে আমাদের লব্ধ জ্ঞানের অনেকটাই প্রতিনিয়ত বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞানের সৃষ্টিতে

আমরা তেমন অগ্রসর হতে পারিনি। তবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ক যে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে তা আয়ত্ত করতে আমরা চেষ্টা করছি। সে প্রয়াস তীব্র না হলে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়বে। একসাথে কাজ করলে আমরা আমাদের জানার পরিধিকে হয়তো অতিক্রম করতে পারবো, আর নিরাময়অযোগ্য রোগীদের সেবায় অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সেবার মান বাড়াতে পারবো। গত ৫০-৬০ বছরে সারা পৃথিবীতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে, শুরুর দিকে বাজারে যার তাৎক্ষনিক তেমন কোন চাহিদা ছিল না।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার কোন বিলাসবহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা নয়।

কয়েকটি দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার শুরু করা হয়েছিলো নিরাময়হীন রোগীদের অর্থ-সাশ্রয়ী সেবার একটি বিশেষ রূপে। অনেক প্রোগ্রামের বাজেট করা হয় এমনভাবে যাতে করে স্বাস্থ্য সেবার যথেষ্ট আয় হয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মূল উদ্দেশ্য খরচ বাচানো নয়, এর লক্ষ্য থাকে যথার্থ একটি সিদ্ধান্ত নেয়া, দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে। রোগী ও পরিবারের জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সাধারণত ফলাফল দাড়ায় অনর্থক খরচ রোধ। সরকারের নীতিনির্ধারকগণের অবশ্যই এই নীতিটি বোঝা দরকার এবং মেনে নেয়া দরকার যে খরচ বাচানো একটি একত্রীভূত ধারণা। অধিকাংশ রোগীর জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার ব্যয়বহুল তো নয়ই, বরং অর্থ-সাশ্রয়ী। বিশেষায়িত প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানের জন্য সবসময়ই অত্যন্ত দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজন পরে, সেইসাথে নির্দিষ্ট ব্যক্তিভিত্তিক সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট কর্মচারীর দরকার হয়, এবং এর সাথে অনেক সময় দামি টেকনোলজি বা ঔষধের দরকার হতে পারে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার একজন মানুষকে রোগী হিসেবে নয়, একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখে। প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর হতে আমৃত্যু মানুষটির যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। এবং তার পরিবারকে মৃত্যু-পরবর্তী বিয়োগান্তক সেবা দিয়ে থাকে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার কি?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার জীবন-সংশয়ী এবং জীবন-সীমিতকারী রোগে আক্রান্ত রোগী এবং তার পরিবারের সব ধরণের কষ্ট কমায়। প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিরাময়হীন রোগীদের শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ের চিকিৎসা নয়। একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে যে, প্যালিয়েটিভ কেয়ার শুরু করা উচিত না যতক্ষণ না ডাক্তার বলে যে রোগী আর ভালো হবে না। অথচ প্যালিয়েটিভ কেয়ার রোগের অন্যান্য চিকিৎসা যেমন সার্জারি, কেমোথেরাপি এগুলোর পাশাপাশি একই সাথে চলতে পারে। সার্জারি, কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপির কারণে যেসমস্ত দুর্ভোগ তৈরী হয় প্যালিয়েটিভ কেয়ার তার মমতাময় স্পর্শে সেগুলো কমাতে সাহায্য করে।

"প্যালিয়েটিভ" শব্দটির মানে কি?

আমাদের অনেকের কাছেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার শব্দটি একটি নূতন শব্দ। ল্যাটিন শব্দ Palliare' বা 'to cloak' = আলখাল্লা হতে এ শব্দটি উদ্ভূত। প্রাক্তন গ্রীক দার্শনিক এবং ধর্মযাজকদের পোশাক। ব্যালফোর মাউন্ট নামে একজন কানাডিয়ান ইউরো-ক্যান্সার শল্যবিদ ১৯৭৪ সালে এ শব্দটি চয়ন করেন। ব্যালফোরের আরেকটি বড় পরিচয় হলো, তিনি বিশ্বের প্রথম হাসপাতাল প্যালিয়েটিভ কেয়ার শুরু করেন- যা ১৯৭৬ সালে কানাডার মনট্রিলের রয়েল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে স্থাপিত হয়। তিনি রয়্যাল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ক্যান্সার রোগীদের রাখবার জন্যে হসপিসের-মতো একটি ওয়ার্ড তৈরি করেছিলেন। সে সময়ে হসপিস শব্দটি যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকাতে বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষায় শব্দটি তখন ব্যবহৃত হতো নার্সিং হোমের কার্যপরিধি বোঝানোর জন্য। ব্যালফোর জানতেন তার রোগীদের রোগ তিনি ভাল করতে পারবেন না। তাই ঠিক করলেন তার নূতন ওয়ার্ডকে নাম দেবেন "প্যালিয়েটিভ কেয়ার ওয়ার্ড"। প্যালিয়েটিভ শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ হল যার দ্বারা কোন কিছুর মান উন্নত করা যায়। সেই থেকে শুরু, আধুনিক ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত হতে লাগলো এ শব্দ।

অক্সফোর্ড ডিকশেনারি একে স্থান দিয়েছে নীচের অর্থসহ:

১) একটি ঔষধ বা চিকিৎসা যা ব্যথা কমায়, রোগের মূল কারণকে ভাল না করে।

২) একটি কাজ বা একটি সিদ্ধান্ত, যা নেয়া হয়, একটি কঠিন পরিস্থিতিকে ভাল ভাববার জন্যে, যদিও সমস্যাটির মূল কারণগুলো সমাধান করা যায় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্যালিয়েটিভ কেয়ার (২০০২) সংজ্ঞাঃ

"প্যালিয়েটিভ কেয়ার এমন একটি উদ্যোগ যা নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের এবং তাদের পরিবারের জীবনের মান বাড়ায়, দুর্ভোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের মাধ্যমে, যা ব্যথা ও অন্যান্য শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আত্মিক সমস্যাগুলো দ্রুত চিহ্নিত করে নিখুঁতভাবে সনাক্ত করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।"

প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে সাধারণভাবে নিম্নোক্তভাবেও প্রকাশ করা যায়, যা

- ব্যথা ও অন্যান্য কষ্টকর উপসর্গ থেকে মুক্তি দেয়।
- জীবনকে মূল্য দেয় এবং মৃত্যুকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে।
- মৃত্যুকে দ্রুততর করা অথবা স্থবির করার মতো মানসিকতা এতে নেই।
- রোগীর সেবায় মানসিক এবং আত্মিক দিকগুলোকে জড়িত করে।
- একটি সহায়ক ব্যবস্থা প্রদান করে যাতে রোগীকে তার মৃত্যু পর্যন্ত যতটা সম্ভব ভালভাবে বেচে থাকতে সাহায্য করা যায়।
- একটি সহায়ক ব্যবস্থা প্রদান করে যাতে রোগীর পরিবার রোগীর দেখাশোনা করার সময়ে এবং রোগীর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে নিজেদের সামলে রাখতে পারে।
- একটি দলগত উদ্যোগ ব্যবহার করে রোগী এবং তার পরিবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য।
- জীবনের মান বাড়ায় এবং হয়তোবা রোগের গতির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব রাখে।
- রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহারযোগ্য, অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার পাশাপাশি, যেমন কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি এবং যে সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা রোগের জটিলতা ভালভাবে বুঝতে ও ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে সেগুলো গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানের মূলনীতিগুলো কি?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার মূলত তিনটি নীতির উপর নির্ভর করে দেয়া হয়ঃ উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ, মনোসামাজিক সেবা এবং রোগের ব্যবস্থাপনা। একটি ভালো যোগাযোগের উপর নির্ভর করেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল রোগী ও তার পরিবারকে রোগ, সম্ভাব্য চিকিৎসা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে ও চিকিৎসা গ্রহণে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া প্রয়োজনে সাহায্যকারী কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ তৈরী করে দিতে পারে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার মূলনীতিসমূহ

উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ

মনোসামাজিক ও আত্মিক সেবা

রোগ ব্যবস্থাপনা

কাদের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার দরকার?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার দীর্ঘমেয়াদী, জীবন সংশয়ী বা নিরাময় সম্ভাবনাবিহীন অসুখে আক্রান্ত যে কোন বয়সের মানুষের জন্যে, রোগের যে কোন অবস্থায় প্রযোজ্য। শিশুদের ক্ষেত্রে প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রাপ্তি শিশুর বয়স ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ একটি শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যেমন নবজাতক, অতি শৈশব, মধ্য শৈশব এবং প্রাক- শৈশব কালীন সময়ে তার আচার-আচরন এবং শারীরিক চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে।

- ক্যান্সার,
- শেষ পর্যায়ের হার্ট, ফুসফুস, লিভার, কিডনি রোগ
- স্মৃতিভ্রংশ
- এইচআইভি/এইডস
- স্নায়ু রোগ যেমন - মটর নিউরন ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া
- শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মগত হার্টের বা স্নায়ুরোগ ইত্যাদি।
- অরক্ষিত বয়স্ক মানুষের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার খুব দরকার হয়।

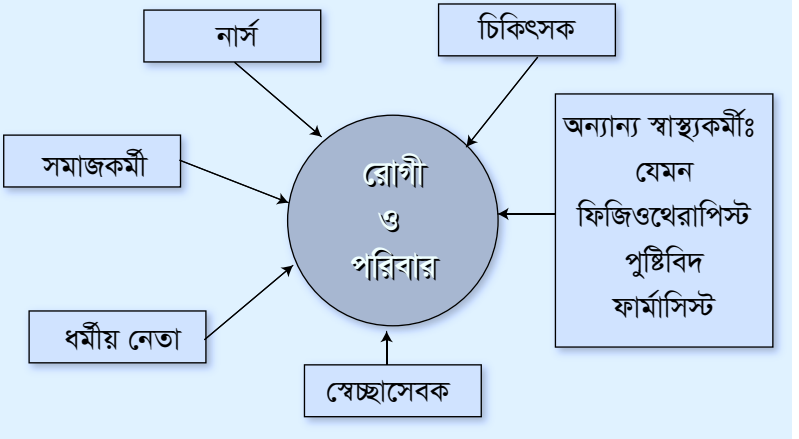
কোথায় প্যালিয়েটিভ কেয়ার দেয়া হয়?

- হাসপাতালের অন্তঃবিভাগ, বহিঃবিভাগ
- নার্সিং হোম
- হসপিস
- রোগীর বাসায়
- মূলতঃ রোগী যেখানে থাকে বা চায়।

কারা প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করে?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি দলগত কাজ। একটি বহুমুখী বিশেষ দলের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। দলে চিকিৎসক, নার্স, সমাজ সেবক, স্বেচ্ছাসেবক, আধ্যাত্মিক কর্মী এবং চিকিৎসা সেবার অন্যান্য বিশেষায়িত শাখাগুলোর সেবকগণ থাকেন।

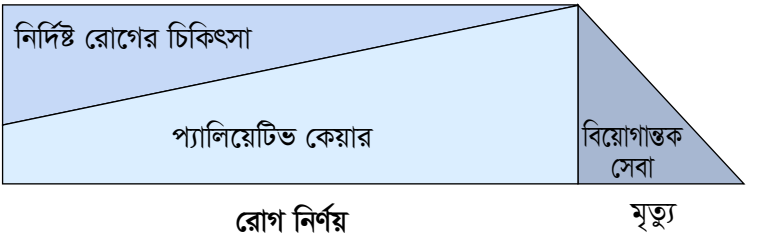
একটি সমন্বিতদল প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করে



একজন সেবাপ্রদানকারী এক দিকে যেমন কঠিন হৃদয়ে তার নিজস্ব কাজের ভুল ধরবেন, সমস্যা ও কঠিন সময়ের মোকাবিলা করবেন; অন্যদিকে তাঁকেই কোমল হৃদয়ে রোগী ও পরিবারের সামনে দাঁড়াতে হবে। প্যালিয়েটিভ কেয়ারে রোগী ও পরিবারের অগ্রাধিকার সবার ওপরে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হলো প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেবাদল। কেন? কারণ, কর্মীরাই তো রোগী ও পরিবারকে সেবা দেবেন। যদি রোগী স্বস্তিতে থাকেন, পরিবার খুশি থাকেন, তাহলে সেবাদলও খুশি থাকবেন।

কখন প্যালিয়েটিভ কেয়ার দেয়া হয়?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার দেয়ার ক্ষেত্রে সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রোগের যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশ করে এটি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আরোগ্যকারি চিকিৎসার সাথে শুরু করতে।



প্যালিয়েটিভ কেয়ার কি কি সেবা দিয়ে থাকে?

একটি কঠিন রোগ শুধু শরীরকে আক্রান্ত করে না। মানুষের অস্তিত্বকে ছুঁয়ে যায়। মানুষের অস্তিত্বের মাঝে তার শরীর, মন, পরিবার, লোকালয়, সংস্কৃতি সবকিছু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করা যায় না। আর রোগটি তার অস্তিত্বের সবখানে স্পর্শ করে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার এক ধরণের সর্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা যা অস্তিত্বের সকল কষ্ট কমানোর প্রয়াস পায়।

শারীরিক সমস্যা

ব্যথা, ঘুমের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পেটে পানি ইত্যাদি।

মানসিক সমস্যা

ভয়, দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, আশাহীনতা, সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি।

সামাজিক সমস্যা

প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল রোগী ও তার পরিবারকে সম্ভাব্য চিকিৎসা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে ও সাহায্য করতে পারে। এছাড়া সাহায্যকারী কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ তৈরী করে দিতে পারে।

সামাজিক সমস্যা

অর্থাভাব
চাকুরিসংক্রান্ত
ইনস্যুরেন্স
পরিবার সংক্রান্ত
আইনগত, ইত্যাদি।

আত্মিক সমস্যা

মানুষ যখন কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হয়, সে জীবনের অর্থ খোঁজে, অনেক সময় ধর্মবিশ্বাস তার নিজের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমার কেন এ রোগ হলো, আমি কি পাপ করেছি, আমি কোথায় আছি-কোথায় যাবো, আমার অতীত ভুলগুলোর জন্য কি আমাকে ক্ষমা করা হবে? ইত্যাদি প্রশ্ন তাকে কুড়ে খেতে থাকে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল এ সময়ে রোগী ও তার পরিবারকে তাদের বিশ্বাস এবং নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে। যার ফলে তারা বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিয়ে শান্তির পথে এগোতে পারে।

প্যালিয়েটিভ মেডিসিন কি?

প্যালিয়েটিভ মেডিসিন স্বাস্থ্যশিক্ষার একটি বিশেষ বিভাগ যা চিকিৎসকদের জন্য নির্ধারিত, যাতে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য সেবা শেখানো হয়। প্যালিয়েটিভ মেডিসিন চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিষয়ের একসাথে কাজ করার সুযোগ তৈরী করে, যার ফলে শেষ পর্যায়ের রোগীদের জন্য অনেক নিত্যনূতন উপশমকারী সেবা প্রদানের সম্ভাবনা তৈরী হয়। ২০১৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এমডি ইন প্যালিয়েটিভ মেডিসিন' কোর্স চালু হয়েছে। প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের উপর পোস্ট-গ্রাজুয়েশন কোর্স রয়েছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ২৬তম দেশ।

প্যালিয়েটিভ নার্সিং কি?

প্যালিয়েটিভ নার্সিং স্বাস্থ্যশিক্ষার একটি বিশেষ বিভাগ যা নার্সদের জন্য নির্ধারিত, যাতে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য সেবা শেখানো হয়।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং শেষ সময়ের সেবা মানে কি এক?

প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং শেষ সময়ের সেবা শব্দ দুটোর দর্শন একই। শেষ সময়ের সেবা বলতে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের শেষ মুহূর্তগুলোর সেবাকে বোঝায়। এটি হতে পারে কিছু মুহূর্ত, কিছু ঘণ্টা, দিন, মাস বা বছর। একজন মানুষ যখন আর এক বছর বাঁচবে বলে অনুমান করা যায়, তখনই তিনি শেষ সময়ের দিকে এগোচ্ছেন বলে ধরা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শেষ সময়ের সেবা সবসময়ই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অংশ, কিন্তু প্যালিয়েটিভ কেয়ার সবসময় শেষ সময়ের সেবা নয়।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং হসপিস কেয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি?

হসপিস শব্দটি অনেকেই শুনে থাকবেন, যদিও বেশিরভাগ মানুষেরই জানা নেই বা সংশয় আছে যে হসপিস গুলো 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার' প্রদান করে থাকে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং হসপিস কেয়ার দুটোই মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে আরাম প্রদান করে। দু-ক্ষেত্রেই সেবার দর্শন একই। তবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার রোগ সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি একত্রে দেয়া যায়। কিন্তু হসপিস কেয়ার অন্যান্য সব চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে, যখন পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে রোগমুক্তির আর কোন সম্ভাবনা নেই তখন শুরু করা হয়। আমেরিকাতে হসপিস কেয়ার দেয়া হয় এমন মানুষদের যাদেরকে দুজন চিকিৎসক সত্যায়িত করে দেন যে তারা আর ছয় মাস বাঁচবেন। এ পদ্ধতি বলবত থাকার পেছনে মূল কারণ তাদের ইনস্যুরেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় প্রদানের ব্যবস্থা।

একটি নতুন সমাজ ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার সংস্থা স্থাপন করার পদ্ধতিঃ
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একটি নতুন সমাজ ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার সংস্থা স্থাপন করতে কিছু সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করা জরুরী। ধাপগুলো হল-

১. প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি বিভিন্ন সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে এবং আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

২. স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে সামাজিক ও মানসিক সেবা প্রদানের জন্য।

৩. প্যালিয়েটিভ কেয়ার সহকারীদের দ্বারা রোগীর মৌলিক নার্সিং সেবা নিশ্চিত করা।

৪. স্থানীয় চিকিৎসক ও নার্সের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা সেবা ও নার্সিং সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. একটি বহির্বিভাগ ক্লিনিক সেবার ব্যবস্থা করতে হবে (যার জন্য দরকার অন্তত একজন ডাক্তার ও একজন নার্স যারা স্থানীয় হাসপাতালের সাথে রোগীর প্রয়োজনে যোগাযোগ করবে)।

৬. একটি পদ্ধতি তৈরী করতে হবে যার মাধ্যমে কার্যক্রমটি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করা হবে।

নতুন এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম কিছু লোকবল প্রয়োজন যারা সক্রিয়ভাবে কার্যক্রমটি পরিচালনা করবেন এবং সামনের দিনগুলোতে সমাজের মানুষকে যুক্ত করে এই সমাজ ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রমটি আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলবেন। প্রধান যে লোকবল দরকার একটি সমাজ ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করা হল।

লোকবল	দায়িত্ব ও কর্তব্য	ন্যূনতম যে প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়
সংবেদনশীল স্বেচ্ছাসেবক কিন্তু অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগীতা করবেন (যেমন- রোগীর জন্য যাতায়াত ও খাবার খরচ জোগাড় করতে সহযোগীতা করা, তহবিল সংগ্রহে সহযোগীতা করা)	সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ (অন্তত ২ ঘণ্টা) যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে মৌলিক বিষয়সমূহ, গৃহ সেবা এবং রোগী ও তার পরিবার, দলের অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে কথোপকথন নিয়ে প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	রোগীদের গৃহ সেবা প্রদানে সহযোগীতা করবেন যেমন- ● মানসিক সেবা প্রদান ● মৌলিক নার্সিং সেবা প্রদান ● রোগীকে চলাচলে সাহায্য করানো রোগীর অনিয়ন্ত্রিত কোন সমস্যা থাকলে তা সেবা সমন্বয়কারীকে জানানো	স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য মৌলিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রশিক্ষণ (আনুমানিক ১৬ ঘণ্টা তত্ত্বীয় প্রশিক্ষণ সাথে ৪ দিন গৃহ সেবা) যেখানে যোগাযোগ দক্ষতা, মানসিক সেবা, রোগী মূল্যায়ন করা, নার্সিং সেবা, গৃহ সেবা, উপসর্গ নিয়ন্ত্রণের মৌলিক ধারণা, কোন সমস্যা হলে কিভাবে তা নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানাতে হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পড়ানো হবে।
কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী		
প্যালিয়েটিভ কেয়ার সহকারী	রোগীদের গৃহ সেবা প্রদানে সহযোগীতা করবেন যেমন- ● মানসিক সেবা প্রদান ● মৌলিক নার্সিং সেবা প্রদান ● রোগীকে চলাচলে সাহায্য করানো রোগীর অনিয়ন্ত্রিত কোন সমস্যা থাকলে তা সেবা সমন্বয়কারীকে জানানো	প্যালিয়েটিভ কেয়ার সহকারীদের জন্য মৌলিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রশিক্ষণ (আনুমানিক ৬ সপ্তাহ) যেখানে যোগাযোগ দক্ষতা, মানসিক সেবা, রোগী মূল্যায়ন করা, নার্সিং সেবা, গৃহ সেবা, উপসর্গ নিয়ন্ত্রণের মৌলিক ধারণা, কোন সমস্যা হলে কিভাবে তা নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানাতে হবে ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে পড়ানো হবে।
স্বাস্থ্য সেবা দানকারী পেশাদার ব্যক্তি		
নার্স	দলের মধ্যে মুখ্য পেশাদার ব্যক্তি যিনি নার্স নেতৃত্বাধীন গৃহ সেবা প্রদান করবে এবং/অথবা কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক-এ সেবা প্রদান করবেন	স্টাফ নার্স যাদের অন্তত ৬ সপ্তাহব্যাপী মৌলিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
ডাক্তার	চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন এবং তত্ত্বাবধায়ন করবেন নার্সদের ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক, গৃহ সেবা, বহির্বিভাগ এবং অন্তবিভাগ সেবা	ডাক্তার যাদের অন্তত ৬ সপ্তাহব্যাপী মৌলিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

তুমি যখন কারো সঙ্গে দেখা করো তখন হাসিমুখ নিয়েই তার সামনে যাও। কেননা হাস্যোজ্জ্বল মুখ হলো ভালোবাসার শুরু।

- মাদার তেরেসা

শারিরীক সেবা

ব্যথা এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার

প্যালিয়েটিভ কেয়ারের বিশ্বব্যাপী গবেষণায় দেখা যায় রোগীদের শারিরীক প্রায় ৫০টির মতো বিভিন্ন উপসর্গ হতে পারে। তার মধ্যে ব্যথা সবচেয়ে কষ্টকর উপসর্গ। এ বইতে আমরা ব্যথা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

ব্যথা কাকে বলে?

ব্যথার সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন রবার্ট টোয়াইক্রস, একজন রিটায়ার্ড ব্রিটিশ চিকিৎসক (জন্ম-২৯ জানুয়ারি, ১৯৪১), যিনি ছিলেন ১৯৭০-এর দশকের হসপিস কর্মকান্ডের প্রাথমিক পরিচালকদের একজন।

"ব্যথা হল তাই যা রোগীকে কষ্ট দেয়"

১৯৭৯ সালে "ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টাডি অফ পেইন" ব্যথার সংজ্ঞা দেয় এভাবে,

"একটি অপ্রীতিকর সংবেদনশীল এবং আবেগময় অভিজ্ঞতা যা প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতিকর কোষের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে অথবা এ ধরণের কোন ক্ষতির মতো বর্ণিত হয়।"

ব্যথার উপাদান গুলো কি কি ?

- শারিরীক
- মানসিক
- সামাজিক
- আত্মিক

সার্বিক ব্যথা

সার্বিক ব্যথায় উপরের চারটি ক্ষেত্র একত্রে মিলিত হয়ে রোগীর উপর প্রভাব ফেলে।

আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, যার ফলে ব্যথার প্রকাশও প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা। শুধু তাই নয়, একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সময়ভেদে তা বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

- শারীরিক - অন্যান্য উপসর্গ সমূহ, অনিদ্রা, চিকিৎসার বৈরী প্রভাব, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি
- মানসিক - রোগ দেরিতে নির্ণয় অথবা চিকিৎসা কাজ না করার ফলে উদ্ভূত রাগ, মৃত্যু বা ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার ভয়,
- চেহারা বা আকৃতি নষ্ট হওয়ার ভয়, অসহায় বোধ করা
- সামাজিক - পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা, একাকীত্ব বা পরিত্যাক্ত অনুভব করা
- আত্মিক - আমার কেন এটা হল? বিধাতা আমাকে কেন এত কষ্ট দিলেন? এ সব কিছুর মানে কি? জীবনের কি কোন অর্থ আছে? আমার অতীত ভুলগুলোর জন্য কি আমাকে ক্ষমা করা হবে?

প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ব্যথাঃ

- প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ব্যথা কি সচরাচর দেখা যায়?
  - প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ব্যথা অনেক বেশী দেখা যায়।
  - শেষ পর্যায়ের ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ৭০-৯০% ব্যথায় কষ্ট পান।
  - শিশুরাও বয়স্কদের মত একইভাবে ব্যথা অনুভব করে।
  - সব বয়সের শিশু, এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরাও ব্যথা অনুভব ও স্মরণ রাখতে পারে।

কিভাবে ব্যথানাশক ঔষধগুলো ব্যবহার করতে হয়?

আজকে থেকে ৩৮ বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮০ সালে তুলনামুলকভাবে কম খরচে কি করে ব্যথা উপশম করা যায় সে নিয়ে একটি কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যা ৭০-৯০% ক্যান্সার রোগীদের ব্যথা কমাতে পারে। নীচের পাঁচটি বাক্যাংশের দ্বারা এ পদ্ধতিটিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যথা চিকিৎসার মূলনীতিসমূহঃ

- মুখে খাওয়ানো
- ঘড়ি ধরে
- সিঁড়ি অনুযায়ী
- নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য
- খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়া

"মুখে খাওয়ানো"

সম্ভব হলে ব্যথানাশক ওষুধগুলো মুখে খাওয়াতে হবে। যে রোগীদের গিলতে কষ্ট হয়, অনিয়ন্ত্রিত বমি বা পাকস্থলি-নাড়ী বাধাপ্রাপ্ত হলে।

ত্বকের নিচে ওষুধ প্রদান আরেকটি ভাল উপায়।

"ঘড়ি ধরে"

নার্স রোগী ও তার পরিবারকে ব্যথানাশক ওষুধগুলো "ঘড়ি ধরে" নির্দিষ্ট সময় পর পর খেতে বলবেন। কখনই শুধুমাত্র ব্যথা হলে ওষুধ দেবেন না। ব্যথানাশকের নির্দিষ্ট মাত্রা রোগীর ব্যথা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে, ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে যতক্ষণ না রোগীর ব্যথা কমে। ব্যথানাশকের পরবর্তী মাত্রাটি আগেরটির কাজ শেষ হওয়ার আগে দিতে হবে। এভাবে ব্যথা সার্বক্ষণিক কমিয়ে রাখা সম্ভব। চলাফেরা করলে বা নিয়মের বাইরে ব্যথা শুরু হলে "সহায়ক মাত্রার" ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। এটি ২৪ ঘণ্টার ওষুধের মোট স্বাভাবিক মাত্রার ছয় ভাগের এক ভাগ পরিমাণ দিতে হবে।

"সিঁড়ি অনুযায়ী"

এ সিঁড়ির তিনটি ধাপ রয়েছে। ব্যথার ওষুধগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১) আফিম জাতীয় নয় ২) আফিম জাতীয়।

প্রথম ধাপটি আফিম জাতীয় নয় এমন ওষুধ নিয়ে তৈরি। যদি এ ধাপের ওষুধ ব্যথা কমাতে না পারে, তবে এর সাথে কম হতে মাঝারি ব্যথার জন্য, একটি আফিম জাতীয় ওষুধ যোগ করতে হবে। যখন উপরোক্ত দুটির সমন্বয়ও ব্যথা কমাতে পারে না, তখন মাঝারি থেকে তীব্র ব্যথায় কার্যকরী আফিম জাতীয় ওষুধ দিতে হবে।

একসাথে একটি গ্রুপ থেকে শুধুমাত্র একটি ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। যদি কোন ওষুধের কার্যক্ষমতা কমে যায়, তখন একই গ্রুপের একই মানের ওষুধ (যেমন কোডিনের পরিবর্তে dextropropoxyphen দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

সহযোগী ওষুধ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট লক্ষণের জন্য দেয়া উচিত।

"নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য"

আফিম জাতীয় ওষুধের আদর্শ কোন মাত্রা নেই। "সঠিক" মাত্রা হল সেই মাত্রা যা রোগীর ব্যথা কমায়। মরফিন বড়ির পরিসর হতে পারে প্রতি ৪ ঘণ্টায় ৫ মিগ্রা থেকে ১০০০ মিগ্রামের বেশি।

"খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়া"

একজন রোগীর মরফিন বড়ি খাবার সময়তালিকা এমন হতে পারে সকাল ৭টা, সকাল ১১ টা দুপুর ৩টা, সন্ধ্যা ৭টা এবং রাত ১১টা। এ সময়সূচী ব্যথানাশক ওষুধের কার্যকারিতা এবং ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা করে। ওষুধের লিখিত সময়তালিকা রোগী ও তার পরিবারকে দেয়া উচিত। এ তালিকায় ওষুধের নাম, ব্যবহারের কারণ (যেমন, "ব্যথার জন্য", "কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য"), মাত্রা (কত মিলি, কতটি বড়ি) এবং প্রতিদিন কতবার।

১। নিয়মিত **ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহারে জোর দিন।**

২। কখনই শুধুমাত্র ব্যথা হলে ওষুধ দেবেন না।

৩। ব্যথা প্রতিরোধ করা প্রতিকারের চেয়ে সহজতর।

৪। মরফিন বড়ি প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর খেতে হবে। প্রতিদিনকার ওষুধের সকালের প্রথম ডোজ এবং রাতের শেষ ডোজ, সকালে রোগীর ঘুম থেকে জাগা আর রাতে ঘুমানোর সাথে মিল রেখে খেতে হবে।

৬। ওষুধের সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে রোগীকে আগে থেকে সাবধান করে দেয়া উচিত।

কোন ব্যথানাশক আমাদের পছন্দ করা উচিত?

আফিম নয় এমন ব্যথানাশকঃ

আফিম নয় এমন ব্যথানাশকগুলোর মধ্যে প্যারাসিটামল, এনএসএইডসমূহ এবং অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক এসিড (এএসএ) অন্তর্ভুক্ত। এএসএ, প্যারাসিটামল, আইবুপ্রোফেন এবং ইন্ডোমেথাসিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আদর্শ জরুরী ওষুধের তালিকায় রয়েছে। বেশিরভাগ দেশেই বিভিন্ন ধরণের এনএসএইডসমূহ পাওয়া যায়। কোনটি ব্যবহার করা হবে তা সাধারণত ওষুধ প্রাপ্তি এবং দামের উপর নির্ভর করে।

ক্যান্সার রোগ হাড়ে ছড়ালে যে তীব্র ব্যথা হয় তা কমাতে এনএসএইড সমূহ সবচেয়ে বেশী উপযোগী। এক্ষেত্রে প্রায়ই হাড়ে প্রতিস্থাপিত ক্যান্সার কোষ হতে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হতে থাকে এবং এনএসএইডসমূহ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হওয়াকে আংশিকভাবে রোধ করে।

আফিম নয় এমন ব্যথানাশকগুলো মূলত নরম কোষগুচ্ছ এবং মাংসপেশিতে ক্যান্সার ছড়ানোর ফলে যে ব্যথা হয় তাদের ক্ষেত্রে বেশী উপকারী।

এ গ্রুপের ওষুধগুলো একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পরে আর ব্যথা কমাতে পারেনা। এ জাতীয় ওষুধে ব্যথা পুরোপুরি না কমলে, একটি আফিম জাতীয় ওষুধ যোগ করতে হবে।

যদি এ গ্রুপের নির্দিষ্ট কোন ওষুধে কষ্টকর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবে এ গ্রুপেরই অন্য একটি ওষুধ ব্যবহার করা দেখা যেতে পারে। যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো রয়েই যায় তবে আফিম জাতীয় ওষুধ দিতে হবে।

ওষুধের নাম	আদর্শ মাত্রা	সর্বাধিক মাত্রা	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
প্যারাসিটামল	৬৫০-১০০০ মিগ্রা প্রতি ৪-৬ ঘণ্টা পরপর	৬ গ্রাম	যকৃত এবং মূত্রনালির বিষক্রিয়া
আইবুপ্রোফেন	৪০০ মিগ্রা প্রতি ৪-৬ ঘণ্টা পরপর	৩ গ্রাম	পাকস্থলি-অন্ত্রের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম
ইন্ডোমেথাসিন	২৫ মিগ্রা প্রতি ৬ ঘণ্টা পরপর	২০০ গ্রাম	পাকস্থলি-অন্ত্রের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি

আফিম জাতীয় ওষুধ

আফিম জাতীয় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

- কোষ্ঠকাঠিন্য ঃ নার্স প্রতিদিন পায়খানা হয়েছে কিনা রোগীকে জিজ্ঞাসা করবেন। কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ খাওয়া কেন জরুরী তা বুঝিয়ে বলবেন।
- চুলকানি ঃ সাধারণত ব্যবহার শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায়। যদি এরপরেও থাকে তাহলে, ডাক্তার অ্যান্টিহিস্টামিন দেবেন
- বমিভাব এবং বমি ঃ নার্স প্রতিদিন রোগীকে জিজ্ঞাসা করবেন। যদি থাকে তবে রোগীকে নিয়মিত বমি বন্ধের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করবেন।
- তন্দ্রাচ্ছন্নতা ঃ রোগী ও তার পরিবারকে বোঝাতে হবে যে এটি সাধারণত ছোট একটি সমস্যা, যা অল্প কয়েকদিন স্থায়ী হয়।

আফিম জাতীয় ওষুধের বিষক্রিয়াঃ

যদি রোগীর এ সমস্যাগুলো থাকে তাহলে ডাক্তারকে দ্রুত জানাতে হবেঃ

- নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা মিনিটে সাতটির কম হলে
- চোখের মনি ছোট হয়ে গেলে
- ঝাঁকুনি হলে
- অতিরিক্ত তন্দ্রাচ্ছন্নতা হলে
- চিকিৎসা করা হয় ন্যালোক্সোন দিয়ে
- ডাক্তার পরীক্ষা করার আগে মরফিন বা অন্য কোন আফিম জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

চিকিৎসকেরা যে ভুল করেন তা হল তারা মনের চিকিৎসা না করে শরীর সারাতে চান। যদিও মন আর শরীর অবিচ্ছেদ্য তাই আলাদা করে চিকিৎসা করা উচিত নয়।

- প্লেটো

মানসিক সেবা

প্যালিয়েটিভ কেয়ারে সাধারণত উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা দেখা যায়। এর প্রাথমিক লক্ষণ ও প্রতিকার প্রত্যেক কর্মীর জানা দরকার। এই বইতে আমরা উদ্বেগ, বিষন্নতা এবং স্মৃতিভ্রমে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রাথমিক করনীয় সম্পর্কে বলবো। খুব বেশি সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে হবে। পাশাপাশি কাউন্সিলের কাছে গিয়ে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি নেওয়া যেতে পারে।

উদ্বেগ

উদ্বেগ কী?

উদ্বেগ হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা। দা আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ) উদ্বেগকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, এটি একটি আবেগ যা মানসিক দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা এবং শারীরিক পরিবর্তন যেমন- রক্তচাপ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ভীষণ দুশ্চিন্তা, নেতিবাচক চিন্তা থেকে এ রকম হয়। এতে আচরণ ও শরীরের মধ্যে পরিবর্তন আসে।

ধারণা করা হয় যেকোনো মানুষেরই জীবনের এক পর্যায়ে এসে উদ্বেগের সমস্যা দেখা দেয়। আবার কেউ কেউ আছেন যাদের রয়েছে সবসময় অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করার অভ্যাস, এর ফলে উদ্বেগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী আরো কিছু কারণ থাকতে পারে: দীর্ঘ সময় ধরে কাজ এবং কাজ নিয়ে মানসিক চাপে থাকলে সেটা অফিস কিংবা বাড়ির কাজ যাই হোক, দীর্ঘমেয়াদী কোনো অসুখ থাকলে যেমন-থাইরয়েড সমস্যা, অন্য কোনো মানসিক সমস্যা আগেই থাকলে, যেমন-হতাশা, অতীত জীবনে কোনো দুর্ঘটনা, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিংবা মাদকজাতীয় ওষুধ থেকেও হতে পারে।

মাঝে মধ্যে উদ্বিগ্ন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যদি রোগী প্রতিনিয়ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, তখন তা হয়ে ওঠে সমস্যার কারণ। যদি এই সমস্যা থাকে, তাহলে দেখা যাবে রোগী সারাক্ষণই দুশ্চিন্তা করছেন কিংবা এমন কিছু হবে ভেবে ভয় পাচ্ছেন যা আসলে হবেই না। উদ্বেগ তাকে এতোটাই আচ্ছন্ন করে রাখবে যে তিনি স্বাভাবিক হতে পারবেন না।

জীবনসংশয়ী রোগে কেন উদ্বেগ হয়?

বিভিন্ন কারণে উদ্বেগ হতে পারে

- নিজেকে অন্যের বোঝা বোধ করলে উদ্বেগ হতে পারে। কোনো পরিস্থিতি ভালোভাবে মোকাবিলা করতে না পারার চিন্তা থেকে উদ্বেগ হতে পারে। পরিবারের উপর কর্তৃত্ব থাকবে না, ছেলেমেয়েরা কষ্টের মধ্যে পরবে ইত্যাদি চিন্তায় উদ্বেগ হতে পারে। ব্যক্তির চিন্তার মধ্যে যদি ভবিষ্যৎ খুব বেশি প্রাধান্য পায়, তখনো উদ্বেগ হয়।
- শারীরিক ব্যথা বা অন্য কোন অনিয়ন্ত্রিত কষ্ট থাকলে, কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করলে এটি হতে পারে।
- প্রিয়জন হতে আলাদা হয়ে পড়লেও এটি হতে পারে

উদ্বেগের লক্ষণ সমূহ

উদ্বেগের কিছু শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণ আছে। যেমন:

মানসিক লক্ষণসমূহ
অস্থিরতা, ঘাবড়ানো এবং উত্তেজিত বোধ করা
বিরক্ত লাগা
কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে কষ্ট হওয়া
প্রচন্ড ভয় পাওয়া কিংবা সবচেয়ে খারাপ পরিণতির কথা ভাবা
নেতিবাচক চিন্তা করা
অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করা

শারীরিক লক্ষণগুলোঃ

ঠিক মতো ঘুম না হওয়া	দুঃস্বপ্ন দেখা
বুক ধড়ফড় করা	বুকে চাপ অনুভূত হওয়া
মাথা ঘুরানো, অজ্ঞান হয়ে পড়া	ঘেমে যাওয়া
গলা শুকিয়ে যাওয়া	পেটে ব্যথা
মাথাব্যথা	শ্বাসকষ্ট হওয়া
বদহজম	পেটের মধ্যে ঘুর ঘুর অনুভূতি
ডায়রিয়া	অসুস্থ লাগা

দ্রুত নিঃশ্বাস নেয়া, দম বন্ধ হয়ে আসা
স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি টয়লেটে যাওয়া
শরীরের মাংসপেশিতে টান ধরা, ব্যথা করা
ভয়ে হাত-পা কাঁপতে থাকা কিংবা ঝাঁকুনি খাওয়া
হাত-পা, ঠোঁট অসাড় হয়ে যাওয়া
নারীদের ক্ষেত্রে হট ফ্লাস, কোল্ড ফ্লাস ইত্যাদি।

উদ্বেগ হলে কি করবেন?

উদ্বিগ্ন হলেও এই সবগুলো লক্ষণ যে সবার থাকবে এমন কোনো কথা নেই। আবার এসব লক্ষণ থাকলেই যে কারো এ ধরনের মানসিক সমস্যা হয়েছে তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু এই লক্ষণগুলো যদি প্রতিদিনই অনুভব করা যায় তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বেশি অসুবিধা হলে কখনো কখনো মনোচিকিৎসকের পরামর্শও নেওয়ার প্রয়োজন হয়। সময়মত সাহায্য নিলে অনেক বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

- গবেষণা বলে, নিরাময়অযোগ্য রোগী তার রোগ সম্পর্কে পুরোপুরি অর্থাৎ রোগের সার্বিক অবস্থা, সম্ভাব্য চিকিৎসা, রোগের গতি সম্পর্কে জানলে উদ্বেগ অনেক কমে যায়। গবেষকেরা বলছেন, মানসিক চাপ বা ধকল কাটানোর অন্যতম উপায় হচ্ছে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। নিজের সঙ্গে কথা বলা। এতে মনের ওপর চাপ না বাড়িয়ে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথমেই দুশ্চিন্তা একেবারে চলে যাবে না। তৃতীয় পক্ষ হয়ে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা

নেতিবাচক অনুভূতি দূরে রাখতে সাহায্য করে। এটা ধীরে ধীরে কমবে। ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে।

- মনোযোগকে অন্যদিকে ঘোরাতে হবে। যেই জিনিসটি নিয়ে উদ্বেগ হচ্ছে, তা নিয়ে না ভেবে অন্য কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগী হতে হবে।
- নেতিবাচক চিন্তাগুলো কীভাবে ইতিবাচক করা যাবে, সেই বিষয়ে ভাবতে হবে।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নাক দিয়ে শ্বাস টেনে একবার নিয়ে ৫ পর্যন্ত গুনুন, কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে আবার পাঁচ পর্যন্ত গুণে নিন এবং মুখ দিয়ে আবার শ্বাস ছাড়তে হবে দ্বিগুণ সময়ে অর্থাৎ দশ পর্যন্ত গুণে গুণে। এভাবে প্রতিদিন কয়েকবার করা যেতে পারে। ধীরে ধীরে সময় বাড়ানো যেতে পারে।
- কাজের চাপের কারণে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ হলে ছোট ছোট কয়েকটি ভাগে কাজ ভাগ করে নিতে হবে।
- উদ্বেগ কমাতে পছন্দের কোন কাজ যা মনে প্রশান্তি আনে এমন ভিন্ন কোন কাজ করা যেতে পারে। যেমন- গান শোনা, শপিং করা, বই পড়া, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি।

বিষন্নতা

বিষণ্নতা এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সমস্যা, যেখানে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে কোনো ব্যক্তি হতাশ, মন খারাপ এবং সবকিছুর প্রতি অনীহা বোধ করে। জীবনকে তার কাছে অযৌক্তিক, অহেতুক এবং উদ্দেশ্যহীন মনে হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষণ্নতার কারণে কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। বিষণ্নতার তীব্রতা বেশি। বিষণ্নতা রোগে বেশ কিছু শারীরিক লক্ষণ, যেমন ঘুমের সমস্যা, রুচির সমস্যা, ক্লান্তিবোধ, শরীরে ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায়। বিষণ্নতা রোগের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। সব পর্যায়ের স্বাস্থ্য পেশাজীবী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক মহল, প্রচারমাধ্যম এবং সচেতন সমাজের কার্যকরী ভূমিকা বিষণ্নতা প্রতিরোধ, দ্রুত শনাক্ত এবং প্রতিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বিষণ্নতার কারণ সব সময় জানা যায় না। সাধারণত শারীরিক, মানসিক আর সামাজিক কারণে বিষণ্নতা হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক রোগ, যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার, শ্বাসকষ্টের সমস্যা ইত্যাদিতে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। এই দীর্ঘমেয়াদি রোগগুলোকে দ্রুত শনাক্ত আর

নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে। মানসিক কোনো টানাপোড়েন আর ব্যক্তিত্বের গড়ন বিষণ্নতার জন্য দায়ী। তাই মানসিক চাপমুক্ত থেকে ব্যক্তিত্বের গড়নকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে শিশু অবস্থা থেকেই সামাজিক দক্ষতা বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে। সামাজিক বৈষম্য, অস্থিরতা, বঞ্চনা আর দারিদ্র মনের ওপর বিশেষ চাপ তৈরি করে। এই চাপ থেকে কারও কারও মধ্যে বিষণ্নতা হতে পারে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিষণ্নতা নিয়ে কুসংস্কার আর ভ্রান্তবিশ্বাস কমাতে হবে। বিষণ্নতা একটি চিকিৎসাযোগ্য সমস্যা। এটির দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তৃত কুপ্রভাব সম্পর্কে সবাইকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে। বিষণ্নতাকে যত দ্রুত নির্ণয় করা যাবে, তত তাড়াতাড়ি এটি নিরাময় হবে এবং ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কমতে থাকবে।

বিষণ্নতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মন খারাপ বা দুঃখবোধ। তবে অনেক সময় আমরা মন খারাপকে বিষণ্নতা মনে করি অথবা বিষণ্নতাকে সামান্য মন খারাপ ভেবে গুরুত্ব দিই না। দুঃখবোধ বা স্যাডনেস হচ্ছে মানুষের একটি স্বাভাবিক ও মৌলিক আবেগ। সুস্থ মানুষের জীবনে দুঃখবোধ হওয়া এবং মন খারাপ থাকা স্বাভাবিক ঘটনা।

অন্য দিকে বিষণ্নতা হচ্ছে সেই আবেগের অস্বাভাবিক বা দীর্ঘমেয়াদি বহিঃপ্রকাশ। বিষণ্নতার সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, কমপক্ষে দুই সপ্তাহজুড়ে দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা, কোনো কিছু করতে ভালো না লাগা, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, হঠাৎ রেগে যাওয়া, আগে যেসব কাজ বা বিনোদন করতে ভালো লাগত, এখন সেগুলো ভালো না লাগা, মনোযোগ কমে যাওয়া, ক্লান্তি বোধ করা, ঘুমের সমস্যা (যেমন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়া বা ঘুম না হওয়া অথবা বেশি ঘুম হওয়া), রুচির সমস্যা (যেমন খেতে ইচ্ছা না করা, খিদে না থাকা বা বেশি বেশি খাওয়া), শারীরিক মিলনে আগ্রহ কমে যাওয়া, সাধারণ বিষয় ভুলে যাওয়া, সব সময় মৃত্যুর চিন্তা করা, নিজেকে অপরাধী ভাবা, আত্মহত্যার চিন্তা ও চেষ্টা করা ইত্যাদি।

কিছু শারীরিক সমস্যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়; বিশেষত নারী রোগীদের মধ্যে, যেমন মাথাব্যথা, মাথায় অস্বস্তি, মাথা-শরীর-হাত-পা জ্বালা করা, গলার কাছে কিছু আটকে থাকা, শরীরব্যথা, ঘাড়ব্যথা, গিটে গিটে ব্যথা, বুকজ্বলা, বুকব্যথা, নিশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি। কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এসব শারীরিক সমস্যার কারণ পাওয়া যায় না। নিজেকে খুব ছোট ও অপাঙ্ক্তেয় মনে হতে পারে, উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে যায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচরণের অস্বাভাবিকতাও দেখা দিতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, এসব লক্ষণের সব কটি একসঙ্গে একজনের মধ্যে সব সময় থাকবে না আবার কয়েকটি লক্ষণ থাকলেই ধরে নেওয়া যাবে না যে কারও মধ্যে বিষণ্নতা রোগ হয়েছে। বিষণ্নতা রোগের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রাতারাতি বিষণ্নতামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য ধৈর্য ধরে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে এবং নির্দেশমতো ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে নীচের বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করুনঃ

১. আত্মবিশ্বাস ও আশা ধরে রাখুন

নিজের সমস্যাকে চিহ্নিত করে নিন আগে। আপনি চেষ্টা করুন আপনার রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানার। ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও পাবেন যাতে ফিজিওথেরাপি বা অন্য অনেক প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবেন। সেই অনুযায়ী নিজের ভালো থাকার দিকটি দেখতে থাকুন। সময়কে দুঃখ-ভারাক্রান্ত না করে, প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগান। অনেকে পারিবারিকভাবে বিষণ্নতা সমস্যাটি পেয়ে থাকেন। সবকিছুকে হালকাভাবে নিতে শিখুন।

খুব সহজ উপায় হলো, কিছু ক্ষেত্রে লাগামটা ছেড়ে দেওয়া। এর মানে হলো, আপনাকে ভালো করতেই হবে, এমন মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা। আপনি যদি শুরুতেই ধরে নেন আপনার রোগ আর ভালো হবে না, তাহলে মানসিকভাবেই এটি আপনার জন্য নেতিবাচক হয়ে দাঁড়াবে। ভালো ও মন্দ এই দুটি নিয়েই আমাদের জীবন। আপনার চিকিৎসা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সবকিছু প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ও আশার সাথে করতে থাকুন। ভবিষ্যতে পরিণামে কী হবে কিংবা হবে না, সবকিছু ঝেড়ে ফেলে আজকের দিনটা সক্রিয়ভাবে পার করুন।

২. শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দূর করুন

ব্যথা বা অন্যান্য শারীরিক উপসর্গের দ্রুত চিকিৎসা নিন। কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখুন নিজের জন্য। খিটখিটে মেজাজ, হতাশা, উৎসাহ হারিয়ে ফেলা থেকে শুরু করে অল্পতেই রেগে যাওয়া, সহজেই ভুলে যাওয়া কিংবা বিভিন্ন অসামাজিক আচরণ দেখে দেবে আপনার মধ্যে। দেখা গেল আগে যেসব বিষয় সহজেই গুছিয়ে নিতে পারতেন, সেটা আর কিছুতেই হচ্ছে না। উল্টো সবার সামনে সহজেই রেগে যাচ্ছেন। এটা সবার জন্য ক্ষতিকর। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারেন একমাত্র আপনিই। খারাপ চিন্তা হয়তো সবসময় এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবে চেষ্টা করুন ইতিবাচক

চিন্তা করতে। ভাবুন যা চাইছেন তা ইতিবাচকভাবেই পাবেন। নিজের সাথে কথা বলুন। কোন বিষয়গুলো আপনাকে মানসিক চাপে ফেলছে? কী করলে চাপ কম হতো? বর্তমানে কী অবস্থা? এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কী করতে পারেন- এগুলো ভাবুন। জীবনের বাকি লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করুন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে কাজে ব্যাপৃত করুন। ভুলে যাবেন না যে, কোন কিছু করার জন্য এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। সময় কখনই দেরী হয়ে যায় না। লক্ষ্যপূরণে যা যা করা দরকার তার একটি তালিকা তৈরি করুন। আপনার চাহিদা অনুসারে তালিকাটি সাজান এবং সেই তালিকা অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এই পদক্ষেপগুলোর চর্চা মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন উপদেশ কাজে লাগায় তারাই, যারা বিজ্ঞ।

৩. নিয়মিত ব্যায়াম করুন

ব্যায়াম মানসিক চাপ তৈরিকারী হরমোনের নিঃসরণ কমায়। সুখি হরমোন হিসেবে পরিচিত এনডোরফিনের মাত্রা বাড়ায়। তাই যত ব্যস্তই থাকুন না কেন একটু সময় বের করে ব্যায়াম, যোগ ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন বা সকাল-সন্ধ্যায় অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন। হাঁটতে বের হলে দেখবেন নিজেরই ভালো লাগছে। এ ধরনের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে আপনার ভেতরের উদ্বেগ বেরিয়ে আসবে। এতে নিজেও অনেকটা নির্ভার বোধ করবেন।

৪. নিয়মিত ঘুমান

ঘুম শরীরকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে উঠার একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করুন। নিয়মিত সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমানো যে কোন ধরণের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। সকালে ঘুম ভাঙলেই মনের ভেতর দুঃশ্চিন্তা ভর করতে চাইবে, একেবারেই পাত্তা দিবেন না। পবিত্রতার সাথে দিনটি শুরু করুন। ভালো এবং আশার কথা ভাবুন।

৫. ধৈর্য ধরুন ও কাজে মনোযোগ দিন

যদি শুরুতেই ধরে নেন যে কাজটি আপনার দ্বারা হবে না, বা কত তাড়াতাড়ি কাজের সুফল পাবেন কিংবা আপনি পারবেন না, তাহলে সঠিকভাবে কাজ করার উদ্দীপনাই নষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিক জীবনযাপন নষ্ট হয়ে যাবে। কাজের জন্য কাজ এবং পরিশ্রম করতে থাকুন। একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখবেন আপনার চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার ভাগটা অনেক বেশী হয়ে পরেছে।

৬. সাহস রাখুন

বেঁচে থাকার জন্য নিত্যদিন সংগ্রাম করতে হয়। আর আপনি যদি কোনো কিছুতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে সাহসের সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রবণতা নষ্ট হয়ে যাবে, যা আপনার ব্যক্তিত্বের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৭. নিয়মিত বিষণ্ণতার ঔষধ সেবন করুন।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ওষুধ খেতে হবে।

৮. সঠিক খাবার গ্রহন করুন

মানসিক চাপে থাকলে খাওয়ার প্রতি অনেকেরই অনীহা হতে পারে। মনে রাখবেন, না খেয়ে থাকা চাপকে বা সমস্যাগুলোকে কমিয়ে দেবে না বরং খাবার আপনার শরীরকে কর্মক্ষম রাখবে এবং চাপ দূর করার পদক্ষেপগুলো নিতে সাহায্য করবে। এ সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন। ক্যাফেইন গ্রহণ কমিয়ে দিন। সকালের নাস্তা ভালোভাবে করুন। দিনে অন্তত ছোটবড় মিলিয়ে ছয় বেলা খাবার খান। গমে রুটি, পাস্তা ইত্যাদি খান। ভিটামিন এ এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। পাশাপাশি গ্রিন টি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খান।

৯. শিথিল থাকতে শিখুন

মানসিক চাপের সময় দেহ ও মনকে শিথিল রাখা জরুরি। অতিরিক্ত আবেগ ক্ষতির কারণ। আর কথায় কথায় রেগে যাওয়া আপনার ব্যক্তিত্বের জন্যই নেতিবাচক। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রয়োজনে কিছুটা সময় নিয়ে ব্যাপারটি নিয়ে ভাবুন। মানসিক চাপের কারণ সহজেই চলে যাবে না। এটা দূর হতে সময় লাগবে। তাই এসময় নিজেকে শান্ত রাখা জরুরি। মনকে শিথিল রাখতে প্রিয় গান শুনুন।

১০. ডায়রি লিখুন

প্রতিদিন রাতে আজকের ঘটে যাওয়া অন্তত ৫টি সুখের বিষয় লিখুন আর বিধাতার কাছে এ চমৎকার দিনটি আপনাকে দেয়ার জন্য শুকরিয়া আদায় করুন। পাশাপাশি আপনি কী চান বা কী করলে আপনার ভালো লাগত সেই বিষয়টিও লিখুন। ডায়রি লেখার এই অভ্যাসটি মানসিক চাপ কমাতে অনেকটা সাহায্য করবে আপনাকে।

প্রলাপ

জীবন সংশয়ী রোগে আক্রান্ত শেষ পর্যায়ের রোগীদের মধ্যে ডেলিরিয়াম বা প্রলাপ বা বিকার বা ভুল বকা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এটি একটি জটিল রোগ। দেখা যায় ১৩.৩-৪২.৩ শতাংশ দুরারোগ্য রোগীর প্রলাপ হতে পারে। যদিও রোগীদের ভুল বকার কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত না করার ত্রুটি সারা বিশ্বের চিকিৎসকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এটি মস্তিষ্কের পূর্ণ কার্যাবলীকে ব্যাহত করে। বোঝার ক্ষমতা, রোগীর সচেতনতা, মনোযোগ, চিন্তাশক্তি, জ্ঞান, মেজাজ, মনে রাখার ক্ষমতা, আচরণজনিত নানা সমস্যা বা ঘুম-জেগে থাকার স্বাভাবিক দৈনন্দিন চক্র ইত্যাদি সকল বিষয় এলোমেলো করে দেয়। প্রলাপের কারণে মানসিক বিভ্রান্তি, মতিভ্রম এবং উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। ভুল বকার মানে শরীরের ভিতর অন্য গুরুতর সমস্যা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভুল বকা সেই দিক নির্দেশ করে। গবেষণায় বলে যে, রোগীরা ভুল বকা শুরু করলে বাড়তি সতর্ক হতে হবে।

যখন মানসিক অসুস্থতার কথা বলা হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, তার পিছনে রয়েছে শারীরিক, বংশ পরম্পরা বা পরিবেশগত কারণ। এই সব কারণের ফলে একজনের মস্তিষ্কের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে এবং মানসিক স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। কয়েকটি শারীরিক অসুস্থতা যেমন- মস্তিষ্কে আঘাত, স্নায়ুর দুর্বলতা, সার্জারি, তীব্র শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, যে কোনও অবস্থার ফলে ক্রমশ মস্তিষ্কের কার্যাবলির অবক্ষয় ঘটছে। সাধারণত বয়স্ক মানুষ, দুর্বল, ডিমেনশিয়া, শরীরে কোন ক্ষত বা পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগী, চোখের সমস্যা, কানে কম শোনা, একাধিক ঔষধ একবারে পাওয়া, কিডনির সমস্যা, এবং অপুষ্টির রোগীদের বেশী বিকার দেখা দিতে পারে।

মস্তিষ্কের কোষগুলি শারীরিক আঘাত (যেমন- মস্তিষ্কের গুরুতর ক্ষত, স্ট্রোক, রাসায়নিক এবং টক্সিনের প্রভাব, শরীরগত কারণে মস্তিষ্কের অসুখ, যথেচ্ছ তামাকের ব্যবহার) বা মানসিক বা সামাজিক আঘাতের কারণে (যেমন- প্রতারণার শিকার হওয়া, শারীরিক বা মানসিক ভাবে তিরস্কার এবং গুরুতর মানসিক যন্ত্রণা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব পরিস্থিতির শিকার হলে একজনের মধ্যে চিন্তাশক্তি, মনে রাখার ক্ষমতা, বোঝা বা শেখার আগ্রহ নষ্ট না হলেও, বিচারশক্তি কমে যায়। এই ক্ষেত্রে তাকে নিয়মিত দেখাশোনা করার দরকার হয়। যদি এই ধরনের ব্যক্তির

প্রতি অবহেলা করা হয়, তাহলে সমস্যা আরও গভীরে চলে যায়। প্রলাপ সাধারণত সাময়িক এবং তীব্র।

বহু কারণেই একজন ব্যক্তি এহেন পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন।

- শরীরে প্রদাহ বা ঘা
- স্টেরয়েড, অপিওয়েড, অ্যান্টি-কোলিনারজিক ও বেনযোডায়াজেপিন জাতীয় ঔষধ
- ধূমপান, মদ্যপান
- আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া
- শরীরে কম অক্সিজেন প্রবাহিত হওয়া
- কাবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া
- ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়া
- হার্টে সংক্রমণ
- ট্রানসিয়েন্ট ইসকিমিক অ্যাটাক (টিআইএ)
- মস্তিষ্কের অসুখ বা কাজকর্মের ব্যাঘাত হলে ব্যক্তিত্বের সমস্যা এবং আচরণগত ত্রুটি লক্ষ করা যায়। মস্তিষ্কের ঠিক কোন অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে লক্ষণগুলি চিহ্নিত করা এবং সমস্যার কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়।
  - দেখার সমস্যা।
  - সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা।
  - হাঁটা-চলার সময় ভারসাম্যের অভাব।
  - মাঝে মধ্যেই প্রচন্ড রেগে যাওয়া, চিৎকার করা বা বদ্ধমূল ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়া।

চিকিৎসাঃ রোগের গুরুত্ব বা গভীরতা অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। তবে ০.২-১.৫ মিগ্রা. হ্যালোপেরিডল এক্ষেত্রে অনেকসময় কার্যকর হতে দেখা যায়। বড়ি সবসময় যেমন সাময়িক সমস্যার ক্ষেত্রে বিশ্রাম এবং যথাযথ ওষুধ প্রয়োগই যথেষ্ট। অনেক সময়েই চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন এবং সাপোর্টিভ মাধ্যম গ্রহণ করা হয়।

স্মৃতি ভ্রম

স্মৃতি ভ্রম হলে প্যালিয়েটিভ কেয়ার কি করতে পারে।

একটি আত্মীয় কথনঃ

প্রায় পাঁচ বছর পর দেশে ফিরে শাশুড়ি আমিনার আচার-আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলেন লুতফুন্নেসা। প্রায় ৪০ বছরেরও বেশি সময় এক সাথে থাকছেন তারা। এবারই প্রথম বেশ কিছুদিন দূরে থাকলেন, মানে জরুরী কাজে থাকতে হল। তিনি লক্ষ্য করলেন আমিনা প্রায়ই নিকটত্মীয়দের চিনতে পারছেন না, তাদের নাম মনে করতে পারছেন না। খাবার খেয়েছেন কিনা, কি দিয়ে খেয়েছেন এসব ছোটখাট বিষয় মনে রাখতে পারছেন না। একই কথা বার বার বলছেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করা মানুষটির লম্বা চুলে ফাঙ্গাস হয়ে জটা ধরেছে, শাড়ী অদ্ভুতভাবে পেঁচিয়ে রাখছেন সারা শরীরে। লুতফুন্নেসা ননদদের উপর রীতিমত বিরক্ত হলেন, কেন তারা মায়ের চুল ধুয়ে দেয়নি। তারা জানালেন আমিনা কাউকে তার গায়ে হাত দিতে দেন নাই। কেউ সাহায্য করতে গেলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেছেন। ডাক্তার বলেছেন তিনি হার্টের রোগে ভুগছেন। সেইমত ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে।

তিনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। রাতে ঘুমাতে পারছেন না। অবশ্য তখনও কিন্তু ডাক্তার বলেননি যে আমিনা ডিমেনশিয়া রোগে ভুগছেন। একদিন লুতফুন্নেসাকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, "বউমা, তুমি তো জানো আমার কাছে বেশ কিছু জমান টাকা আছে। নিম (আমিনার মেয়ের ঘরের ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া নাতনী) আমার টাকা চুরি করেছে। আমার ব্যাগে ২৭০০ টাকা নাই। ওকে আর বাসায় ঢুকতে দিও না। আর এখনতো আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা হল যে, কে কখন আমার গয়নাগুলো নিয়ে যায়। আমি বালিশের নীচে রেখেছি এগুলি, আর সারা রাত পাহারা দেই যেন কেউ না নিয়ে যেতে পারে।" গয়না বলতে তার নিত্য ব্যবহার্য একটি গলার চেন, চারটি চুরি আর একটি আংটি। লুতফুন্নেসা বললেন, "মা এক কাজ করেন, গয়নাগুলো আপাতত আমার কাছে দিয়ে দেন, আলমারিতে তুলে রাখি, তাহলে আর কেউ নিতে পারবে না।" ধোঁয়াটে দৃষ্টিতে একটু আলো দেখা গেলো। বললেন, "তুমি আমাকে বাঁচালে বউমা।" সেইদিন লুতফুন্নেসা আমিনাকে বুঝিয়ে তার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে দিলেন নিজহাতে। নাইটি কিনে এনে পরালেন। সেদিন থেকে রাতে আমিনা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে শুরু করলেন। রীতিমত একটি শিশুর মত যত্ন করতে হয়েছে তাকে,

বলছিলেন লুতফুন্নেসা। তার শাশুড়ি ইন্তেকাল করেছেন প্রায় ২০ বছর আগে। তিনি আরো জানালেন তার বড় ননদেরও একই রোগ দেখা দিয়েছে।

নিত্য সত্যঃ এক দুই তিন - জ্বী পাঠক, এই শব্দ তিনটি পড়তে আপনার তিন সেকেন্ড সময় লেগেছে। আর এই তিন সেকেন্ডে পৃথিবীর বুকে আরেকজন মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হলেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়, প্রতি তিন সেকেন্ডে পৃথিবীতে একজন মানুষ নতুন করে ডিমেনশিয়ায় শনাক্ত হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডিমেনশিয়াকে বর্তমানে সারা পৃথিবীর জনস্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ডিমেনশিয়া একটি নিরাময়হীন, জীবন-সংশয়ী এবং জীবন-সীমিতকারী লক্ষণ। পৃথিবীজুড়ে ডিমেনশিয়া এখন বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারন, যার মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ মৃত্যুই গরীব ও মধ্যম আয়ের দেশ গুলোতে ঘটে থাকে। এ বছরের প্রথম দিকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস সূত্রে জানা যায়, সেখানে ডিমেনশিয়া ২০১৫ সালে মৃত্যুর প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ছিল ঐ বৎসর মোট মৃত্যুর শতকরা ১৫.৮ ভাগ। মৃত্যুর সার্টিফিকেটে সেখানে এখন সুনির্দিষ্ট করে ডিমেনশিয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চার লাখের মতো ডিমেনশিয়া রোগী রয়েছে, যা ২০৫০-এ গিয়ে ১৪ লাখ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

১১৭ বছর আগে, ১৯০১ সালে, অগাস্টে নামে মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলাকে বিশ্বের সর্বপ্রথম ডিমেনশিয়া রোগী হিসেবে শনাক্ত করেন ফ্রান্সের ডাঃ অ্যালস আলঝেইমার। আর এখন পৃথিবীতে প্রায় ৫ কোটি মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। তবে লক্ষণীয় যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন ওষুধ আবিষ্কার হয়নি যেগুলো সেবন করলে ডিমেনশিয়া সেরে যাওয়া বা তীব্র হওয়া রোধ করা যায়। ডিমেনশিয়া সম্পর্কে এখনো বেশির ভাগ মানুষ সচেতন না। তাই এখনই যদি আমরা এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করতে সচেষ্ট না হই তবে আগামী ৪০ বৎসরের মধ্যে এটি রূপ নেবে এক মহামারীর।

ডিমেনশিয়া বলতে কিছু উপসর্গের সম্মিলিত উপস্থিতিকে বোঝায় যেমনঃ স্মৃতি ভুলে যাওয়া, চিন্তা করতে না পারা, ভাষাগত বা মানসিক সমস্যা তৈরী হওয়া। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টির বেশী রোগে ডিমেনশিয়া হতে দেখা গেছে। ডিমেনশিয়ার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ কারণ হলো আলঝেইমার ডিমেনশিয়া রোগটি।

পরিসংখ্যানঃ সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হন। তাই বলে এটি কেবল বয়স্কদের সমস্যা নয়।

ডিমেনশিয়া বাংলাদেশে একটি লুক্কায়িত সমস্যা। কেউ কেউ ভাবেন রোগটি একটি বার্ধক্যজনিত রোগ, অর্থাৎ বয়স বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই হবে। অথচ গবেষণা প্রমাণ করে যে ধারণাটি একেবারেই ভুল। কিছুদিন আগেও মেডিক্যাল পাঠ্যপুস্তকে 'বার্ধক্যজনিত ডিমেনশিয়া' বলে আলাদা একটি রোগের বর্ণনা ছিল, যা ১৯৭৬ সালে ডাঃ রবার্ট কার্টজ্যানকৃত চ্যালেঞ্জের ফলে ১৯৮৪ সালে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দি ল্যান্সেট মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নতুন বৈজ্ঞানিক বৈশ্বিক বিশেষণে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রধান দুটি কারণ হিসেবে যথাক্রমে মস্তিষ্কের রক্তনালির রোগ ও হৃৎপিন্ডের রক্তনালির রোগকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একটি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এ সমস্যায় আক্রান্ত হলে গোটা পরিবারই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের রোগীকে পাগল বলে অবহেলা করা হয়। অথচ এ অবস্থায় তাঁর প্রয়োজন সহৃদয় আচরণ ও যথাযথ সেবা যত্নের। আমাদের দেশে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে, ফলে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনি ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার ৭.৩ শতাংশ মানুষ আছেন যাদের বয়স ৬৫ বা ততোধিক। পর্যবেক্ষকদের মতে এ সংখ্যা ২০৫০ সালে হবে ২০ শতাংশ। তবে উদ্বেগের ব্যাপার হলো বর্তমানে আমাদের দেশে একজন বয়স্ক মানুষকে ৯ জন মানুষ সাপোর্ট দিতে পারেন, ২০৫০ সালে এ অনুপাত কমে হবে ১:৩ জন, অর্থাৎ একজন বৃদ্ধকে সাহায্য করতে পাওয়া যাবে ৩ জন মানুষকে। সাপোর্ট বলতে পরিবারের ১৫-৬০ বছর বয়সী মানুষকে বোঝায়।

গবেষণায় জানা যায়, ডিমেনশিয়া নারীদের বেশী হয়। ২০১৫ সালে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ৬১০০০ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল ডিমেনশিয়া। যার মাঝে মহিলা ৪১,২৮৩ এবং পুরুষ ২০,৪০৩ জন ছিলেন। আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ু পুরুষের তুলনায় দ্রুত বাড়ছে। সেই সঙ্গে ডিমেনশিয়ায় ভোগার আশঙ্কাও বাড়ছে। নিপোর্টের এক বিশেষণে দেখা গেছে, ২০০৫ সালে বাংলাদেশের নারীদের গড়

আয়ু ছিল ৬৯ বছর। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩ বছরে। অন্যদিকে ২০০৫ সালে পুরুষের গড় আয়ু ছিল ৬৬ বছর। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৯ বছরে। এই পরিসংখ্যানও সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে বৃদ্ধ নারীদের অধিকতর ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে।

ডিমেনশিয়া আক্রমণের ঝুঁকিসমূহ কিছু দিক আছে যা একজনের আলজাইমার'স রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেমন- ১. বয়স বৃদ্ধি, ২. অতীতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা মাথায় আঘাত, ৩. হৃৎপিন্ডে ব্লক বা ধমনীতে এই রোগ দেখা দেয়া।

কি হয় ডিমেনশিয়ায়? ডিমেনশিয়া কিভাবে হয় বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমতঃ ব্রেনের মূল দুয়েকটি বিষয় জানতে হবে। মানুষের ব্রেনে ১০০ বিলিয়ন নিউরন, ১০০ ট্রিলিয়ন 'সিনাপ্স' এবং ১০-১২ টি নিউরোট্রান্সমিটার রয়েছে। সিনাপ্স হলো দুটি নিউরনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যবর্তী একটি খালি জায়গা। সিনাপ্সের দিকে খেয়াল করলে আমরা দেখি যে, যখনই আমরা কোন ধরণের যোগাযোগ করি, তখন আমাদের ব্রেন কিছু নিউরোট্রান্সমিটার ছাড়ে, যা আমাদের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। যেমনঃ মনোভাব ইতিবাচক হলে গ্লুটামেট, ডোপামিন আর নেতিবাচক হলে গাবাপেন্টিন নিঃসৃত হয়। একটি নিউরন নিউরোট্রান্সমিটার ছাড়ে, এবং আরেকটি তা গ্রহণ করে। এই নিউরোট্রান্সমিটারের সাথে 'অ্যামিলয়েড বেটা' নামে আরেকটি ছোট প্রোটিনও নিঃসরিত হয়। সাধারণতঃ ব্রেনের ময়লা পরিষ্কারক কোষ 'মাইক্রোগ্লিয়া' ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিজেই 'অ্যামিলয়েড বেটা' গুলোকে খেয়ে ফেলে। তাই যখন কম নিঃসরণ হয় তখন 'অ্যামিলয়েড-বেটা' ব্রেনে জমা হতে পারে না, কিন্তু বেশী নিঃসৃত হলে ক্রমান্বয়ে তা জমতে থাকে। পরবর্তিতে ঝাড়ুদার কোষগুলিও অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে তা আর হজম করতে পারে না আর এক ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন ছাড়তে থাকে। এর ফলে যেমন ব্রেনের কোষগুলো ধ্বংস হয় তেমন ডিমেনশিয়া রোগীর শরীরেও জ্বর বা অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। 'টাও' নামে আরেকটি প্রোটিন নিউরনের ভেতরে চলাচল ব্যবস্থা তৈরী করে, এগুলি উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে জট পাকিয়ে ফেলে যা 'ট্যাংগল' নামে পরিচিত। 'ট্যাংগল' তৈরীর ফলে নিউরনে স্বাভাবিক পুষ্টি পদার্থ পৌঁছাতে পারে না, ফলে আস্তে আস্তে কোষগুলো মরে যায়।

এই 'অ্যামিলয়েড-বেটা' ব্রেনে জমা হয়ে 'অ্যামিলয়েড প্লাক' তৈরী করে, যা হতে প্রায় ১৫-২০ বছর সময় লাগে। খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছানোর আগে, ভুলে যাওয়ার পরিমাণ কম থাকে। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় 'চাবিটা কোথায় রেখেছি' 'উনার নাম যেন কি' 'রান্নাঘরে কেন যেন এলাম' ইত্যাদি ধরণের স্মৃতি হারাতে থাকে, যা ক্রমশ নিজের আপন পরিবেশ-পরিজনকে ভুলে যাওয়া, নিজের প্রয়োজন না বোঝা ইত্যাদিতে পর্যবসিত হয় - যা মানুষটির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে।

উপসর্গগুলোঃ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত রোগী হয়তো প্রায় কোনো কাজই নিজেরা সঠিকভাবে করতে পারেন না। প্রিয় মানুষদের বা পরিচিতদের চিনতে পারেন না, সবকিছু মুহূর্তেই ভুলে যান, শখের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, তাঁদের বিচার-বিবেচনাবোধ কমে আসে, কথা বলার সময় সঠিক শব্দ মনে করতে না পারা, একই কথা বারবার বলেন, নিত্যব্যবহৃত জিনিস খুঁজে না পাওয়া, জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে অন্যদের দোষ দিতে থাকেন, বুদ্ধি খাঁটিয়ে কাজ করতে পারেন না, বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের পরিবর্তন ঘটা ইত্যাদি। শিশুদের মতো সহজে রেগে যান, অভিমান করেন, নিজের ঘর চিনতে পারেন না, হঠাৎ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনর্থক রাস্তায় ঘুরতে থাকেন, পরিচিত স্থানে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, এবং সাক্ষাৎ বা কোনো নির্ধারিত অনুষ্ঠানের কথা ভুলে যান। অথবা অনেকের সন্দেহ বাতিক দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে আলঝাইমার'স এর রোগীরা সামান্য কোনো সমস্যার সমাধান করতেও অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়। তা ছাড়া, সময় এবং স্থান নিয়ে ভ্রম কিংবা হঠাৎ করে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়াও আলঝাইমার'স এর লক্ষণ। এ জন্য তারা সম্পূর্ণ অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নিবিড় সাহচর্য ছাড়া ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়।

ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার বা সবচেয়ে কাছের মানুষের উপর এই রোগের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে না পারায় কেউ একজন সর্বদা আলজাইমার'স এর রোগীর আশপাশে থাকতে হয়। এর ফলে পরিবারের মাঝে বেশ সমস্যা হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিং করে মানিয়ে নেওয়া যায়। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগীই জীবনের শেষ দিন, মাস কিংবা বছরগুলো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পার করেন। ব্যথা, অন্যান্য অনেক উপসর্গ রোগী ও তার পরিবারের জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলে, অথচ স্বল্প প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে পরিবারকে সেবার মূল কায়দাকানুনগুলো শিখিয়ে দেয়া যায়। শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি তারা সামাজিক, মানসিক, আর্থিক, এবং আত্মিক সমস্যায় ভোগেন।

ডিমেনশিয়া শনাক্তকরণঃ ২০১১ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অন এজিং এবং আলঝাইমার্স অ্যাসোসিয়েশন ডিমেনশিয়া শনাক্ত করণ প্রক্রিয়া ও গাইডলাইন নতুন ভাবে প্রস্তাব করে। ১৯৮৪ সালের শনাক্তকারী নিয়মগুলো ছিলঃ ১। রোগীর উপসর্গ সমূহের কারণ সম্পর্কে একজন চিকিৎসকের ক্লিনিক্যাল মতামত; রোগী, পরিবার এবং বন্ধুদের রিপোর্ট; কগনিটিভ পরীক্ষার ফলাফল এবং সাধারণ নিউরোলজিক্যাল পরীক্ষা গাইডলাইন শনাক্তকরণের জন্য একই পদক্ষেপ প্রস্তাবের সাথে biomarker পরীক্ষা যুক্ত করতে বলে। biomarker বলতে শরীরের একটি factor বোঝায়, যা একটি নির্দিষ্ট রোগের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি নির্দেশ করে, অথবা রোগটি হওয়ার ঝুকি নির্দেশ করে। এই ধরণের বেশ কয়েকটি পদার্থের মধ্যে মস্তিষ্কে বেটা- অ্যামিলয়েডের পরিমাণ যা পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি (PET) ইমেজিং এবং CSF-এ নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিনের মাত্রা (যেমন, CSF-এ বেটা- অ্যামিলয়েডের ও টাও প্রোটিনের মাত্রা এবং রক্তে নির্দিষ্ট কিছু গ্রুপের প্রোটিনের মাত্রা)

চিকিৎসাঃ

ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসাঃ

পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ডিমেনশিয়া ভাল হয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত নিউরনগুলোর আরো খারাপের দিকে অগ্রসর হওয়ার গতিকে রোধ করার। মতো কোন চিকিৎসা নেই। তবে পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকিগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে ডিমেনশিয়ার রোগীর একমাত্র চিকিৎসা সমর্থন, সহানুভূতি ও সচেতনতা তৈরি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভুলে যাবেন। এমনটি ধরেই নেওয়া হয়। ফলে ডিমেনশিয়া রোগটি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষ সচেতন থাকেন না।

ঔষধ ছাড়া চিকিৎসাঃ সাধারণত চিন্তা করার শক্তি ধরে রাখা বা বাড়ানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেন রোগী প্রতি দিনের সাধারণ কাজকর্ম করতে পারার মাধ্যমে সার্বিক জীবন মান ধরে রাখা এই চিকিৎসার লক্ষ্য। এছাড়া আচরণগত সমস্যা যেমন বিষাদ, উদাসীনতা, বিচরণ, ঘুমের ব্যাঘাত এবং উত্তেজনা। কম্পিউটারাইজড মেমোরি ট্রেনিং, প্রিয় জ্ঞান শোনা যা স্মৃতিকে আলোড়িত করে এবং ঘুমের ব্যাঘাত কমানোর জন্য বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা। তবে মুশকিল হলো ঔষধ দিয়ে

চিকিৎসার মতো এগুলোও ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়নি। তবে ব্যায়াম চিন্তা করার শক্তি ধরে রাখা বা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রোগীর যত্নঃ পরিচর্যাকারীকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে রোগী শুধুমাত্র তার স্মৃতিশক্তি নয় তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু।

ডিমেনশিয়া হলে রোগীর কীভাবে সেবা-যত্ন নিতে হয় তা না জানা থাকায়, ডিমেনশিয়া রোগীদের পাশে থেকে সেবা করা পরিবারের মানুষদের জন্য প্রায়ই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। তাই ডিমেনশিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবায় গৃহভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে পাড়া-মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পৃক্ত করা যায়।

মুমূর্ষু রোগীর যত্নের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজেদের তৈরী করতে হবে। একটি প্রশিক্ষিত সেবা দল নিয়মিত সেবাপ্রদান ছাড়াও, পরিবারকে সাময়িক বিরতি নিতে সাহায্য করতে পারে, যা পরিবারকে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনে উৎসাহিত ও সাহায্য করবে। ডাক্তার ও নার্সরা তাদেও স্নাতক ডিগ্রী গ্রহণের সময় এখনো শুধুমাত্র প্যালিয়েটিভ কেয়ার শব্দটির সাথে পরিচিত হন। এর ফলে তাদের মধ্যে জ্ঞান এবং দক্ষতার একটি বিশাল শূণ্যতা রয়ে যাচ্ছে যার জন্য তারা এ সকল রোগীদের কঠিন শারীরিক উপসর্গ বা মানসিক বিষয় সমূহগুলো এবং প্রান্তিক সময়ে রোগীর সেবা প্রদান করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য কর্মীরা বিশ্বস্ততা এবং ঘটনার গোপনীয়তা রক্ষা তাকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানে সাহায্য করে। বিশ্বাস এবং প্রার্থনা মৃত্যুকে অর্থবহ করে। একজন মানুষের মৃত্যুর আগে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে শান্তি পাওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর্মীগণ রোগীর ও পরিবারের সাথে প্রার্থনা করতে পারে যদি পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ডিমেনশিয়া ঝুঁকি পরিবর্তনঃ যদিও বয়স, নারীত্ব বা জন্মগত ইতিহাস বদলানো যায় না, তবে অন্যান্য ঝুঁকি বদলানো বা পরিবর্তন করা সম্ভব। পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকিগুলো নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, নীচে কিছু দেয়া হলো।

১। ঘুম।

গভীর ঘুম এক ধরণের শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই সময়ে সিনাপ্সে জমা হওয়া সব ময়লা সাফ করে গ্লিয়াল কোষেরা। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দেন যে এক রাতের ঘুম নষ্ট হলেও তা ব্রেনে অ্যামিলয়েড-বেটা বাড়িয়ে দেয়। আর অ্যামিলয়েড-বেটা জমা হলে তা ঘুম নষ্ট করে বলেও প্রমাণ আছে।

২। পুষ্টিকর খাবার

ভালো খাবার হার্টকে শক্তিশালী করে, ফলে ব্রেনে রক্ত চলাচল বাড়ে। আমেরিকাতে নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থানের লোকেদের মধ্যে শারীরিক কার্যক্রমে কম যুক্ত থাকা, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের হার বেশী দেখা যায়।

৩। নিয়মিত ব্যায়াম

প্রাণীদের উপর গবেষণায় জানা গেছে, হালকা খোলামেলা ব্যায়াম অ্যামিলয়েড-বেটা কমাতে সাহায্য করে।

৪। নতুন যোগাযোগ

নতুন ভাষা শেখা, নতুন বন্ধু গড়া, বই পড়া, খেলা, গান শোনা ইত্যাদি সব কাজই আমাদের ব্রেনে নতুন যোগাযোগ গড়ে তোলে। মানুষের ব্রেনে ১০০ ট্রিলিয়নের বেশী সিনাপ্স আছে। আর এটা যত ইচ্ছা বাড়ানো যায়। কিভাবে? নিউরাল প্লাস্টিসিটির মাধ্যমে। যখনই আমরা নতুন কিছু একটা শিখি, তখনই আমাদের ব্রেনে নতুন যোগাযোগ পথ, সিনাপ্স তৈরী হয়।

৫। হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো

হৃদরোগের ঝুঁকিগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ডিমেনশিয়ারও অনুষঙ্গী। যার মধ্যে রয়েছে ধূমপান, মধ্যবয়সে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং বেশী কোলেস্টেরল। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য পরিগঠনে হৃৎপিন্ড এবং রক্তনালীর প্রভাব অনেক। যদিও মানুষের শরীরের সম্পূর্ণ ওজনের মধ্যে মস্তিষ্কের ভাগ মাত্র ২ শতাংশ, তবে মস্তিষ্ক আমাদের শরীরের মোট অক্সিজেন ও শক্তির ২০ শতাংশ গ্রহণ করে। একটি শক্তিশালী হার্ট আমাদের ব্রেনে যথেষ্ট রক্ত পাঠায় আর সুস্থ রক্তনালীর মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টিকর পদার্থ ব্রেনে পৌছে দেয়। গবেষণায় জানা যায় যে সমস্ত কারণ হার্টকে রক্ষা করে, সেগুলো ডিমেনশিয়া হওয়ার ঝুঁকিও কমায়। কিছু ময়নাতদন্ত গবেষণায় জানা যায় ৮০ শতাংশ আলঝাইমার রোগীর হার্টের রোগ থাকে। হৃদরোগের ঝুঁকিগুলো অধিক শারীরিক কার্যক্রম, কম চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এবং ব্লাড প্রেশার সামলে চলতে পারলে ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৬। অধিক পরিমানে সামাজিক, মানসিক ও আত্মিক কাজে যুক্ত থাকা

দেখা যায়, যারা সামাজিক, মানসিক ও আত্মিক কাজে বেশী নিযুক্ত থাকেন তাদের আলঝাইমার ডিমেনশিয়া কম হয়। খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে বিখ্যাত একটি গবেষণায়, ৭৫ বা তার বেশী বয়সী ৬৭৮ জন অংশগ্রহণকারীদের দুই যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলো। নিয়মিত তাদের শারীরিক ও মানসিক চেকআপ করা হতো। মৃত্যুর পরে তাদের কয়েকজনের ব্রেনে অ্যামিলয়েড প্লাক ও ট্যাঙ্গেল পাওয়া যায়। তবে আশ্চর্যজনক তথ্য হল যে জীবিতাবস্থায় তাদের মধ্যে আলঝাইমার ডিমেনশিয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

৭। আজীবন শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ থাকা।

গবেষণায় দেখা যায় যে, বেশীদিন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে, কমসময় আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে, আলঝাইমার ডিমেনশিয়া হওয়ার ঝুঁকি কম। 'Cognitive Reserve Hypothesis' অনুসারে, বেশীদিন পড়াশোনা করার ফলে ব্রেনের বিভিন্ন নিউরনের মধ্যে বেশী সংযোগ তৈরী হয়, যাতে করে ব্রেন নিউরনের বিকল্প পথগুলো ব্যবহার করতে পারে, যদি আলঝাইমারসের জন্য সচরাচর ব্যবহারকৃত পথ গুলো বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে কম সময় আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে একটি কারণ হল, এমন কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য হওয়া যা মানসিকভাবে উদ্দীপক না। এছাড়া কম শিক্ষা অনেকসময়ই নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করে। যা পরবর্তীতে অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, স্বাস্থ্যেও যত্ন নেয়া বা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে ভাল চিকিৎসা গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য যোগায় না।

শেষকথাঃ ডিমেনশিয়া শনাক্ত হওয়া মানে এই না যে রোগী দ্রুত মারা যাবেন। সাধারণত রোগীর আবেগময় স্মৃতিগুলো নষ্ট হয় না। তারা ভালবাসা এবং আনন্দ বুঝতে পারেন। তিনি হয়তো মনে করতে পারবেন না পাঁচ মিনিট আগে আপনি তাকে কি বলেছেন, কিন্তু তার মনে থাকবে আপনি তার ভেতরে কেমন অনুভূতি তৈরী করেছেন। অধিকাংশ মানুষ ডিমেনশিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু জানে না। চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষদের এ বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে জানানো দরকার। এ বিষয়ে সবার জানা ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

দুঃখ নিজেই নিজের খেয়াল রাখতে পারে, কিন্তু আনন্দের পুরোটা উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে তা কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।

- মার্ক টোয়েন

সামাজিক সেবা

একটি গল্পঃ

সময়টা ছিলো ইরাক যুদ্ধের প্রথম দিকে। আমেরিকান সৈন্যদের একটি দল ইরাকের একটি স্থানীয় মসজিদের ইমামের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলো। তাদের লক্ষ্য ছিলো রিলিফ সামগ্রী বিতরণের কাজে ইমাম সাহেবের সাহায্য নেয়া। কিন্তু হঠাৎ করেই সেখানে একটা বিশাল গণ জমায়েতের সৃষ্টি হলো। উত্তেজিত জনতার ভেতরে একটা ধারণা কাজ করছিলো যে সৈন্যদলটি খুব সম্ভবতঃ মসজিদের ইমাম সাহেবকে অ্যারেস্ট করতে বা মসজিদ আক্রমণ করতে এসেছে। শত শত লোক আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ভারি অস্ত্রধারী সেনাদলকে লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে কমান্ডিং অফিসার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ক্রিস্টোফার হিউস দ্রুত ভাবলেন। তিনি একটি লাউড স্পিকার হাতে নিয়ে সৈন্যদের এক হাঁটু গেড়ে বসতে বললেন। এরপর তিনি আদেশ করলেন তাদের রাইফেলগুলো মাটির দিকে তাক করে রাখতে। তার পরবর্তী আদেশ ছিলঃ "সবাই হাসো"।

এ কাজগুলো মুহূর্তেই জনতার মারমুখী ভাব দমনে সাহায্য করলো। কিছু লোক তখনও চিৎকার করছিলো, তবে অধিকাংশই তখন সৈনিকদের হাসির পিঠে হাসছিলো। কেউ কেউ সৈনিকদের পিঠ চাপড়ে দিতে শুরু করলো, যখন তারা দেখলো হিউসের আদেশ অনুসারে সেনাদল হাসিমাখা মুখে আস্তে আস্তে পিছু হটে যাচ্ছে। সেই তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তটি ছিল অনেকটা হিউসের সামাজিক ধারণার উপর নির্ভর করে। হিউস জনতার মনকে পড়তে পেরেছিলেন, বুঝেছিলেন কিভাবে তাদের শান্ত করা যাবে। তার সৈন্যদলের শৃঙ্খলা ও শক্তির উপর বাজি রেখেছিলেন তিনি এবং ঐ মুহূর্তে জুয়া খেলার মতো হলেও, এমন কিছু পদক্ষেপ তাকে নিতে হয়েছিলো, যা ভাষা এবং সংস্কৃতির বাধাকে উৎরে দিতে পারে।

সেই সঠিক শক্তিশালী সিদ্ধান্ত আর জনতার মন জয়ের দক্ষতা, দুটো মিলে আসন্ন একটি বিক্ষোভকে সামলাতে পেরেছিলেন তিনি। একটি বিশৃঙ্খল, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মোড়, একজন মানুষের তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত কিভাবে আমূল বদলে দিতে পারে - এই ঘটনাটি তার একটি চমৎকার আলোকিত উদাহরণ। সেই কঠিন ঘটনা

সামলানোর সিদ্ধান্ত নিতে হিউস-কে তার ব্রেনের যে নিউরনগুলো সাহায্য করেছিলো, ঠিক একই নিউরন গ্রুপের উপর আমরা নির্ভর করি হঠাৎ কোন বিপদে পড়লে আমরা কি দৌড়ে পালাবো না সমস্যার মুখোমুখি হবো - মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে যা অপরিহার্য। এই নিউরনগুলো ব্যবহার করেই একজন রোগী সিদ্ধান্ত নেয় সে তার চিকিৎসকের উপর নির্ভর করবে কিনা, একজন মানুষ ঠিক করে আজকের দিনে, আগামীকাল বা ভবিষ্যতে সে কি করবে। আর এই নিউরনগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে সে ব্যক্তির জীবনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাকেই বলে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রম।

মিরর নিউরনঃ ব্রেন ওজনের দিক দিয়ে মাত্র তিন পাউন্ডের হলেও এটি মানবদেহের সবচেয়ে অগ্রসর অঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর মাঝে এক বিলিয়ন স্নায়ু কোষ রয়েছে যা নিউরন নামে পরিচিত। এর সাথে রয়েছে আরও অনেক সাহায্যকারী কোষসমূহ। বলা হয়, এ বিশ্বের ছায়াপথে যত তারা আছে, সেগুলো সংখ্যায় মানব ব্রেনের মোট নিউরনের সমান। নিউরসায়েন্সের সবচেয়ে মৌলিক আবিষ্কার হলো যে মানুষের ব্রেন পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য, সমাজবদ্ধ হওয়ার জন্য একতারে বাধা। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ফলে মানুষের ব্রেনে বিভিন্ন ধরণের আবেগ-অনুভূতি তৈরী হয়ও মিরর নিউরন নামে বিশেষ গ্রুপের নিউরন দ্বারা। এসব অনুভূতি আমাদের সামাজিক সম্পর্কের স্বরলিপি হিসেবে কাজ করে। সুখের বিষয় হলো যে এ অনুভূতিগুলো নিত্যনুতন তৈরী হয়ে মানুষের আবেগ বদলাতে সাহায্য করে। এ অনুভূতিগুলো বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণ করে যা আমাদের শারীরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, হার্ট থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যন্ত।

ব্রেন বিজ্ঞানে রীতিমত একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই কিছুদিন আগেও মানুষ জানত যে, জন্মের সময় যে পরিমাণ ব্রেন কোষ নিয়ে আমরা জন্মেছি সেটাই তার সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা। মানুষের চিন্তাশক্তি তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার বাইরে যায় না বলে ভাবা হত। কিন্তু এ বিষয়ে ১৯৯৫ সাল ও তার পরবর্তীতে ব্যাপক গবেষণা প্রমাণ করে যে মানুষের ব্রেন সম্পূর্ণ নমনীয় একটি অঙ্গ যেখানে নিউরনের মূল সংখ্যাগুলো বাড়ে না, কিন্তু বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে ক্রমাগত নতুন যোগাযোগ পথ তৈরীর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটতে পারে নানাভাবে - যা প্রতিনিয়ত ঘটতে পারে, এটি neuroplasticity বা স্নায়ু নমনীয়তা নামে পরিচিত। আমাদের প্রতিটি

অভিজ্ঞতা আমাদের ব্রেনে নতুন যোগাযোগ পথ তৈরী করে চলেছে এবং পুরনোগুলো মেরামত করছে বা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। জন্মগতভাবে আমাদের ব্রেনের সুপ্তশক্তির বিন্যাস তৈরী হয়, তবে এর দ্বারা আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, অথবা ব্যবহার নির্ধারিত হয়ে যায় না।

সামাজিক সেবার জন্য জরুরী কিছু পদক্ষেপঃ

১. সামাজিক নিউরসায়েন্স-এর নতুন আবিষ্কার মিরর নিউরন আলোকপাত করে যে কিভাবে আপনি আপনার সম্ভাবনা বাড়াতে ও ক্ষতিগ্রস্ততা কমাতে পারেন। এর দ্বারা আপনি আপনার ব্রেনকে নতুনভাবে সাজাতে পারেন যেন আপনি শান্ত ও ইতিবাচক ভাব অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন। আর এ দুটো ভাবের উপরই নির্ভর করে আপনার মনোযোগ, বাধার সম্মুখীন হওয়া, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং সুখী হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো। শান্ত হতে শেখা মানে কম উত্তেজিত হওয়া, কম উদ্বিগ্ন হওয়া এবং খুব সহজেই চাপে না ভোগা। আপনি নিজে নিজেকে শেখাতে পারেন ভাবতে, অনুভব করতে এবং ব্যবহার করতে। নিয়মিত তা অনুসরণ করলে আপনার ব্রেন আপনাকে সাহায্য করবে শান্ত ও মনোযোগী হতে।

২. সামাজিক নিরাপত্তা ঃ জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (এসকাপ) ১১টি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপের ২০১৮ প্রতিবেদনে বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দিক দিয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশগুলোতে সর্বজনীন পেনশন, বেকার ভাতার মতো বিভিন্ন নিরাপত্তা কর্মসূচি আছে। এর মাধ্যমে সমাজের শীর্ষ ৫-১০ শতাংশ ধনীরা বাদে বাকিরা সবাই কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয়। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন রয়েছে মোট জনসংখ্যার ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ। ভারত যদিও বাংলাদেশের পেছনে রয়েছে, তবে ভারত সম্প্রতি স্বাস্থ্য সুরক্ষার মধ্যে ৫০ কোটি মানুষকে নিয়ে আসার কর্মসূচি নিয়েছে।

শুধু সুবিধাভোগীর হার নয়, সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দের দিক থেকেও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ জিডিপির ১ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যয় করে। এ খাতে সরকারের বরাদ্দ নেপাল ও ভুটানের তুলনায় কম। তবে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের ব্যয় বেশি। পাকিস্তান

ব্যয় করে মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে তুরস্ক। তাদের ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির সাড়ে ১৩ শতাংশ।

৩. এখন দেশে প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ প্রায় ১৪৫টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আছে। দেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৮৬ লাখ। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য, গৃহায়ণ, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা, আর্থিক ও আইনি সহায়তার মতো বিভিন্ন সেবা প্রদানকারীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের অধিকারী নারীদের অন্যান্য সেবার প্রয়োজন হয়। প্রতিবন্ধী নারী ও প্রতিবন্ধী সন্তানের মায়েদের জন্য শুধু প্রতিবন্ধী ভাতাই যথেষ্ট নয়; তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক বন্ধন, চলাচলে সহায়তা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। দেশে যেসব সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আছে তাতে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়া, টানাটানি, সমন্বয়হীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগও ব্যাপক।

৪. সামাজিক সুরক্ষার প্রথাগত কর্মসূচির পাশাপাশি সর্বজনীন পেনশনের মতো কর্মসূচি চালু করা দরকার। দরিদ্র মানুষের অভাব-অনটন এবং দীর্ঘমেয়াদি দুর্দশা লাঘবের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ সামাজিক পরিবর্তন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন করেছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পদের আরও দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার, মজবুত সেবা প্রদানের কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রীয় সমস্যাবলি কার্যকরভাবে মোকাবিলায় সক্ষম একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলা। যাতে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা তৈরি হয়। বাংলাদেশের এমন ব্যবস্থা নেয়া বর্তমান সময়ের জরুরী দাবি।

৫. সম্প্রতি এক হাজার সামাজিক উদ্যোগের ওপর পরিচালিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক জরিপ হতে জানা যায় যে, এসব সামাজিক উদ্যোগে নেতৃত্বদানকারীদের

৭০ শতাংশেরই বয়স ৩৫ বছরের কম। তরুণেরা অতীতেও সামাজিক উদ্যোগ ও সেবামূলক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এখন সামাজিক ব্যবসার মতো নতুন খাতেও তাঁদেরই অগ্রণী হয়ে থাকা জাতীয় আত্মবিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ব্রিটিশ কাউন্সিলের জরিপে আরও জানা যায়, সামাজিক উদ্যোগের বেলায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তারুণ্যের সমাগম বেশি বাংলাদেশে। কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য নেওয়া ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোকে বলা হয় সামাজিক উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগে উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগত মুনাফা না নিয়ে প্রতিষ্ঠানে তা পুনর্বিনিয়োগ করেন এবং সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে থাকেন। সেবামূলক কর্মসূচি পরিচালনা এর উল্লেখযোগ্য বড় এক দিক। জনসংখ্যার বড় অংশই এখন তরুণ যাকে বলা যায় জনসংখ্যা-সুবিধা। এই পরিস্থিতিতে কাজ করা মানুষের সংখ্যা কাজ না-করা মানুষের চেয়ে বেশি থাকে। বাংলাদেশে এখন অন্যের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও কম। প্রতি তিনজন মানুষের দুজনই উপার্জন করে।

৬. সামাজিক উদ্যোগ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মাধ্যমে আরও প্রসারিত করার সুযোগ রয়েছে। দেশের ভেতর থেকেই সেবামূলক কাজের তহবিল সংগ্রহের সুযোগ আগের চেয়ে বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে এক গবেষণা প্রতিবেদনে। তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণ আরও বেশি করে যাতে এ ধরনের উদ্যোগের ভরসা পান, তার জন্য সরকার বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে। গণমাধ্যমও পারে এমন উদ্যোগের প্রেরণা জুগিয়ে যেতে, সফলতার চিত্র দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে। প্রায় প্রতিটি পরিবারে যেখানে জীবন-সংশয়ী রোগসহ মানুষ আছেন, তাদের যে আর্থিক অনটন, যে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে, তার কিছুটা এসব উদ্যোগের মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

৭. প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মূলভিত্তি দলগত কার্যক্রম। একে অন্যের থেকে শেখা ও কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধকরণের মতো যেসব উপাদান সামাজিক পুঁজি গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। দলবদ্ধভাবে কাজ করলে দীর্ঘমেয়াদী ও কঠিন রোগীদের ও তাদের পক্ষে বক্তব্য দাতাদের জোরালো বাক স্বাধীনতাধীনতা ও দর-কষাকষির ক্ষমতা থাকে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মতামত দিলে তা আরও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে শোনা ও বিবেচনা করার সম্ভাবনা থাকে।

৮. সবচেয়ে জরুরী বিষয় হলো এই কাজগুলোতে সঠিক নেতৃত্ব দেয়া। একজন সামাজিক নেতার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকা খুবই দরকার। একটি সংগঠনে অবশ্যই একজন নেতা থাকতে হবে। অনেকে জন্মগতভাবে, অনেকে সামাজিকভাবে নেতৃত্ব শিখে নেন। তারা জানেন কীভাবে আর দশজনকে অনুপ্রাণিত করবেন। যার আচরণ ও উদ্দেশ্য সমাজের আর দশজন মানুষ অনুসরণ করবে। যিনি নেতৃত্ব দেবেন, তার মধ্যে থাকতে হবে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা। তাকে বুদ্ধিমান, আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। ঘটনার প্রতি তাঁর কৌতূহল ও যোগাযোগ দক্ষতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। না হলে তার কাজ প্রকাশ পাবে না।

একজন সামাজিক নেতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নেতাকে চিন্তা করতে হবে
- ঝুঁকি নিতে হবে
- তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে শিখতে হবে
- একজন নেতার আত্মসচেতনতা জরুরি।
- নেতাকে জ্ঞানী হতে হবে।
- দৃঢ়তা ও আবেগ যা লক্ষ্য নির্ধারনের জন্য জরুরী
- উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চার
- পরমতসহিষ্ণুতা
- নিজের ভেতর তাগিদ থাকতে হবে।
- সততা থাকতে হবে।
- দলে কাজ করার মানসিকতা থাকা প্রে
- বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কাজ করেন। সমস্যা মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয়।
- একজন নেতাকে সাহসী হতে হবে।

যখন আমরা সত্যিকার অর্থে জানবো এবং বুঝবো যে পৃথিবীতে আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে – আর আমাদের সময় কখন শেষ হয়ে যাবে তা জানার কোন উপায় নেই। শুধুমাত্র তখনই আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনকে উপভোগ করা শুরু করব – যেন একমাত্র আজকের দিনটাই আমাদের হাতে আছে।

- এলিজাবেথ কুবলার রস

আত্মিক সেবা

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে।"

আত্মিক সেবার বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা।

আত্মিক সমস্যা

একাকীত্ব/ নিঃসঙ্গতা বোধ করা
অপরাধবোধ কাজ করা
রোগ নিয়ে অস্বস্তিবোধ করা
আত্মঘাতী চিন্তা করা

একজন সুস্থ মানুষের প্রতিটি দিন ভরে থাকে অনেক কিছু দিয়ে যেখানে ঘর, সংসার, ঘোরাফেরা, স্বাস্থ্য, পরিবার, আত্মিক দিক ইত্যাদির ছোট ছোট অংশ রয়েছে এবং কাজ তার জীবনের বেশী অংশ জুড়ে থাকে। কিন্তু নিরাময় অযোগ্য একজন মানুষের প্রতিদিনের মূখ্য বিষয় থাকে স্বাস্থ্য - এরপর পরিবার, আধ্যাত্মিকতা এবং খুব ছোট্ট অংশে থাকে কাজ। আর যে মানুষটি মারা যাচ্ছেন তার দিনের সবচেয়ে প্রধান দিক হল আত্মিক দিক এর পর পরিবার কিছুটা, স্বাস্থ্য এবং কাজের অংশ প্রায় নাই বললেই চলে।

বিশ্বাস এবং যোগাযোগের পরিব্যাপ্তি হলো আত্মিক সেবার মূলভিত্তি। ধর্ম ও আত্মিকতা দুটি ভিন্ন জিনিস। ওয়েবস্টার ডিকশনারী ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে-স্বর্গীয় বা অলৌকিক বা অপার্থিব শক্তি যাকে মানা হয় ও পূজা করা হয় পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং শাসক হিসেবে। ওয়েবস্টার ডিকশনারী অনুযায়ী আত্মা যা দেহ বা জাগতিক বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন। আত্মিকতা জীবনের গভীর বর্তমান ও মৃত্যু পরবর্তী অর্থ খোজে।

অন্তরের অবস্থানকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য ধর্মীয় বিধানের ভূমিকা অনেক বড়, যদিও তা একমাত্র পন্থা নয়। একজন মানুষের আত্মিক রূপের প্রকাশ পায় তার

জীবনী শক্তিতে। ব্যক্তি এবং দল হিসেবে আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাবো এসব প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করে আত্মিক শক্তি। আত্মার পবিত্রতা আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহস তৈরি করে জীবনকে পূর্ণতা প্রদান করে। পবিত্রতা মানে জীবনব্যাপী পবিত্রতা অর্থাৎ দেখা, শোনা, বলা, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে মনোযোগী ও আন্তরিক হওয়া এবং পারিপার্শ্বিক পৃথিবী ও অপার্থিব সংযোগ স্থাপন করা।

ভালবাসা, ক্ষমা, জীবনের অর্থ, পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব এ শব্দগুলো বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের অন্তিমকালে প্রধান হয়ে উঠে। গবেষণায় দেখা যায় অন্তিমকালে একজন দূরারোগ্য রোগীর মোট চার ধরণের যোগাযোগ দরকার -

১। সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ- সততা, আশা, কৃতজ্ঞতা।

২। সমাজের সাথে যোগাযোগ - ভালবাসা, খাপ খাওয়ানো।

৩। প্রকৃতির সাথে - যোগাযোগ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হতে উদ্দীপনা নেয়া, সৃজনশীলতা।

৪। নিজের সাথে যোগযোগ - নিজেকে চেনা, পূর্ণতা, অভিন্নতা এবং অন্তরের শান্তি।

প্রত্যেক ধর্মেই আত্মশুদ্ধির পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকসময় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক অধঃপতন, শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা, সচেতনতার অভাব প্রভৃতি সেই আত্মশুদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে প্রয়োজন মানসচর্চা ও মানসিক সাধনা। সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ তার প্রবৃত্তিকে সংযত এবং আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে তোলার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও তার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৭-১০)

আত্মিক সেবার কিছু পদক্ষেপ

১। আশা রাখুন। আশা মানুষের সারা জীবনের প্রয়োজন। আশার রূপ অনেক - শারিরীক সুস্থতা, আরাম, বুদ্ধির বিকাশ, ভালবাসা সামঞ্জস্য করা, সাহস, নিজেকে ক্ষমা করা।

২। সমস্যা চিহ্নিত করুন। আত্মিক সহায়তা নির্ভর করে রোগী বা পরিবারের চাহিদার উপর। তারা কি পেতে চাইছেন।রোগী ও পরিবার কেন্দ্রিক লক্ষ্য আনতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা নিরাময় সম্ভাবনাহীন এই রোগীকে একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যার শারিরীক, মানসিক, সামাজিক এবং আত্মিক দিক রয়েছে। রোগীর মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খা, ভয়, চাহিদা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে তার ধারণা। শেষ মূহুর্তে তার চাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখতে হবে। যা ঘটছে তা যে স্বাভাবিক ঘটনা তা তাদের বুঝিয়ে বলুন।

৩। রোগীর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শোনা - বিশেষ করে ভয়। রাগ বা অন্যান্য আচরণগত সমস্যার ব্যাপারগুলো এবং সেগুলো আরো বিশ্লেষন করা। আর তাদের মনের কথা জানতে হলে প্রথমেই যেটা দরকার তা হলো তাদের কথা শোনা। রোগীর যা কিছু অনুভব তা সমর্থন করা একটি সুন্দর অর্থপূর্ণ সহায়তা প্রদানের ভিত্তিপ্রস্তর।

৪। একসাথে গল্প করা, গল্প বলা ও শোনা, গান শোনা, কবিতা বলা ও প্রার্থনা করা।

৫। একটি 'ভাল মৃত্যু' বলতে রোগী ও পরিবারের ধারনা জেনে নেওয়া।

৬। তাদের নিজস্ব ধার্মিক বা সাংস্কৃতিক দিকগুলো খেয়াল করা।

৭। কারো সামনে চোখের পানি ফেলাটা কোন লজ্জা বা দোষের ব্যাপার নয়। চোখের পানি খুব স্বাভাবিক। তাদের বোঝান যে আপনি তাদের ব্যাপারে যত্নবান। তেমনি তাদের স্নেহ ভালবাসার প্রকাশকেও উৎসাহিত করুন।

৯। রোগীর শেষ ইচ্ছা এবং তার জীবনের খেদগুলো শুনুন।

১০। রোগীর অর্থবহ কোন ইচ্ছা পূরণে তাকে আন্তরিক সহযোগিতা দিন। প্রয়োজনে মনোবিজ্ঞানী, ধর্মগুরু, সমাজকর্মীর কাছে রেফার করতে হবে।

তুমি সাগরে এক বিন্দু পানি নও। তুমি এক বিন্দু পানিতে সম্পূর্ণ এক সাগর।

- রুমি

বিশ্ব প্রেক্ষাপট

আধুনিক প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ইতিহাসঃ

হসপিস আন্দোলনের সূত্র ধরে প্রশমন সেবার আবির্ভাব। চতুর্থ শতাব্দীতে ভ্রমণকারীদের জন্য যে সরাইখানা বা পান্থনিবাস বানানো হতো তাদের বলা হত হসপিস। উণবিংশ শতাব্দীতে এক ধর্মীয় ফরমান দ্বারা আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের জন্য হসপিস নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। পরবর্তীতে সিসিলি সন্ডার্স (২২ জুন, ১৯১৮ - ১৫ জুলাই, ২০০৫) নামক একজন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, যিনি ছিলেন একাধারে নার্স, চিকিৎসক এবং সমাজকর্মী আধুনিক প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সূচনা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা করতেন। এক পর্যায়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, সৈনিকদের মধ্যে যারা ক্যান্সার বা অন্য কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য শুধু শারীরিক চিকিৎসা নয়, আরও দরকার মানসিক, সামাজিক এবং আত্মিক সেবা। এ উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই তিনি কাজ করে যেতে থাকেন এবং পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে লন্ডনে স্থাপন করেন আধুনিক 'সেন্ট ক্রিস্টোফার হসপিস', যা এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী হসপিসসমূহের মধ্যে অন্যতম।

বিশ্বব্যাপী প্যালিয়েটিভ কেয়ার উন্নয়ন মানচিত্রের সর্বশেষ তথ্যে জানা যায় যে, সারা বিশ্বে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ক ১৬০০০ সার্ভিস রয়েছে যা ৩ মিলিয়ন রোগী এবং ৬-১২ মিলিয়ন পরিবার ব্যবহার করে থাকে। ছয় ধাপ উন্নয়নের বিশ্ব জরিপে দেখা যায় ১. কোন আগ্রহ বা উন্নয়ন নাই এমন অংশের সংখ্যা ৩২ শতাংশ, ২। আগ্রহ আছে কিন্তু কোন সার্ভিস নাই ৯.৮%, ৩ক. কয়েকটি সার্ভিস চলছে ৩১.৬%, ৩খ. সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য ৭.৩%, ৪ক. প্রাথমিক একত্রীকরণ ১০.৭% এবং ৪খ. উচ্চতর একত্রীকরণ ১০.৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ৩খ বিভাগে আছে।

মৃত্যুর কারণ অনুযায়ী প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রয়োজনীয়তা (২০১৭ সালের দি ল্যানসেট কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী)।

এই রিপোর্টে রোগীদের কষ্টসমুহকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে

শারীরিক (১১টি উপসর্গ)

রক্তক্ষরণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, মুখশুষ্কতা, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি / অবসাদ, বমি বমি ভাব অথবা বমি, মাঝারী হতে তীব্র ব্যথা, চুলকানি, দুর্বলতা, ক্ষত

মানসিক (৪টি উপসর্গ)

উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, বিভ্রান্তি প্রলাপ বা মানসিক বিকার স্মৃতিভ্রংশতা

নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্যাকেজের মধ্যে আরো রয়েছে ঔষধ, মেডিকেল সরঞ্জাম, মানব সম্পদ, সামাজিক সহায়তা। নীচে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছেঃ

ঔষধ	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আদর্শ তালিকা অনুযায়ী
মেডিকেল সরঞ্জাম	প্রেসার ম্যাট্রেস, খাদ্যনল, প্রস্রাবের নল, তালাবদ্ধ বাক্স, ফ্ল্যাশলাইট, ডায়েপার, অক্সিজেন।
মানব সম্পদ	চিকিৎসক, নার্স, সমাজকর্মী, সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, ফার্মাসিস্ট, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী, সহায়ক স্টাফ (ক্লিনিক্যাল এবং নন-ক্লিনিক্যাল) সামাজিক সহায়তা

"আমাদের কখনও হাল ছাড়া উচিত নয়। আমরা কখনওই সমস্যাকে আমাদের হারানোর অনুমতি দিতে পারি না।"

- এপিজে আবুল কালাম

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বাংলাদেশ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে কিছু সুপারিশ দেয়া হলো

বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবস্থান

দি ল্যানসেট কমিশনের ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৫ সালে মোট মৃতের সংখ্যা ৪০৯,০০০ জন রোগীর সংখ্যা ২৬০,০০০ জন এবং মোট রোগী ৬৬৯,০০০ জন। বাংলাদেশে সীমিত যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করে আসছেন তাদেও মধ্যে নীচের তিনটি প্রতিষ্ঠান অগ্রনী ভূমিকায় আছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মানবসম্পদ গবেষণা প্রশিক্ষণ (নিপোর্ট) ২০১৪ সালে বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা করে। তাতে ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যটি পুনঃপ্রমাণিত হয়। দেখা যায় শতকরা ৯০ জন ক্যান্সার রোগী সনাক্ত হন রোগের একেবারে শেষ পর্যায়ে। এদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ক্যান্সার রোগী জীবনের যেকোন পর্যায়ে মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হন। অথচ ভয়ানক ব্যাপারটি হলো যে, শতকরা ৯৮ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা ব্যথার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা প্রশিক্ষশণ নাই।

এর সাথে রয়েছেন অন্যান্য প্রান্তিক নিরাময় অযোগ্য রোগীগণ। বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, সীমিত সম্পদ নিয়ে বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম দারিদ্র হ্রাসকারী দেশ হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এবং মানব উন্নয়নের দিক থেকে ১৮৭টি দেশের ভিতর ১৪৬তম দেশ। যদিও সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা বিস্তারে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের দাবীদার, কিন্তু শহরে বা গ্রামে, কোথাও, প্রচারের দিক থেকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে গুরুত্ব দেয়া হয় নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর মতে, ক্যান্সার হলো বাংলাদেশে সকল মৃত্যুর ষষ্ঠ প্রধান কারণ । জানা যায়, বাংলাদেশে ক্যান্সার জনিত মৃত্যু ছিল ৭.৫ শতাংশ

এবং ২০৩০ সালে তা হবে ১৩ শতাংশ। প্রতি বছর ২ লক্ষ মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে ১০ লক্ষ লোক মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত। শতকরা ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ রোগী যখন তাদের ক্যান্সার চিকিৎসকের দ্বারপ্রান্ত হন তাদের রোগ নিরাময়ের অবস্থায় থাকে না।

যাদের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ারকেই একমাত্র যৌক্তিক চিকিৎসা বলে থাকেন গবেষকগণ। এই সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। GLOBOCAN এর পরিসংখান অনুযায়ী ২০১২ সালে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪.১ মিলিয়ন এবং ক্যান্সার জনিত কারনে মৃত্যুর সংখ্যা ৮.২ মিলিয়ন। ধারনা করা হয় ২০২৫ সাল নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি বছর ১৯.৩ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হবে। আমাদের দেশে ক্যান্সার রোগীর মৃত্যু হার বেশী হওয়ায় মূল কারন ক্যান্সার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় সনাক্ত হওয়া। রোগের এ অবস্থায় ক্যান্সার থেকে মুক্তি লাভ বা আরোগ্য লাভ করার সুযোগ না থাকায় এ পর্যায়ে ক্যান্সার চিকিৎসার উদ্দেশ্য থাকে তাদের কষ্ট লাঘব, উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রন করা বিশেষ করে ব্যাথা প্রশমন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

ডাক্তার ও নার্সরা তাদের স্নাত্তক ডিগ্রী গ্রহণের সময় এখনো শুধুমাত্র প্যালিয়েটিভ কেয়ার শব্দটির সাথে পরিচিত হন। এর ফলে তাদের মধ্যে জ্ঞান এবং দক্ষতার একটি বিশাল শূণ্যতা রয়ে যাচ্ছে যার জন্য তারা এ সকল রোগীদের কঠিন শারীরিক উপসর্গ বা মানসিক বিষয় সমূহগুলো এবং প্রান্তিক সময়ে রোগীর সেবা প্রদান করতে হিমশিম খাচ্ছেন। ২০১১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র ৭টি হাসপাতাল ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার কেন্দ্র আছে। তাই এই বিশাল জনগোষ্ঠির প্যলিয়েটিভ কেয়ারের চাহিদা পূরণের জন্য গৃহভিত্তিক প্যালিয়েটিভ ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশে এই মূহুর্তে নিরাময় অযোগ্য এবং জীবন সীমিতকারী রোগে আক্রান্ত মানুষের প্রয়োজনীয় মানসম্মত গৃহ সেবা পাওয়ার সুযোগ নাই বললেই চলে। প্যালিয়েটিভ গৃহ সেবার ধারনাটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিপোর্টের সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়, বাংলাদেশে যে কোন মুহূর্তে ৬ লক্ষ মানুষের ব্যথা নিরাময় এবং প্যালিয়েটিভ সেবার দরকার। বয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে

সাথে প্রান্তিক রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেই সাথে বাড়ছে প্যালিয়েটিভ গৃহসেবার প্রযোজনীয়তা। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া যা ২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বর্তমানে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের কাজ চলছে।

বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। "Millenium Developmental Goals (MDG)" বা 'সহস্রাব্দের উন্নয়নে' বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী অর্জন আমাদের সবার মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের শুধু আশা নয়, একটি স্থায়ী উন্মাদনা তৈরি করেছে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানের মূল উপাদানগুলো যেমন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকাঠামো, সম্ভাবনাময় স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী, স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ঔষধ উৎপাদন ইত্যাদি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সর্বস্তরে পাওয়া সম্ভব। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আশা জাগে, বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র ৬/৭টি প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানকারি প্রতিষ্ঠান থাকলেও, বোধহয় বাংলাদেশ একটি চমৎকার অবস্থানে রয়েছে নিরাময় অযোগ্য রোগীদের সেবা প্রদান শুরু করার জন্য। 'Sustainable Developmental Goals (SDG)'- বা টেকসই উন্নয়নের নতুন লক্ষ্যমাত্রায় প্রবেশের এই ক্ষণটি হতে পারে জাতীয় প্যালিয়েটিভ কেয়ার নীতি তৈরির এক শুভক্ষণ।

বাংলাদেশে কর্মরত ৩টি ব্যক্তি পরিচালিত সংস্থার প্যালিয়েটিভ কেয়ার -এর কার্যাবলী সংযুক্ত করা হল।

আশিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট প্রতিস্থাপনের প্রেক্ষাপট ঃ

সালমা চৌধুরী ও জনাব আফজাল হোসেন চৌধুরীর তিন বছরের শিশুপুত্র আশিক হোসেন চৌধুরীকে ক্যান্সারের মত ঘাতক ব্যাধির কারণে ১৯৯৩ সালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বিলেতের মত উন্নত দেশে এক বছর চিকিৎসা চালিয়েও আশিককে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। আশিকের চিকিৎসাকালীন অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে বাংলাদেশে ক্যান্সার আক্রান্ত চিকিৎসারত শিশুদের জীবনমানের উন্নতি এবং তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের লক্ষ্যে আশিকের শোকাহত পিতামাতা নিজস্ব পারিবারিক উদ্দ্যোগে ১৯৯৪ সালে আশিক, সার্ভিং চাইল্ডহুড ক্যান্সার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। আশিক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তা প্রদান করে শিশু সার্ভাইভারদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও যেসব শিশুদের চিকিৎসা সম্ভব নয় তাদের জীবনমান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

যে সকল শিশুরা চিকিৎসা সেবার আওতার বাইরে চলে যায়, তখন তাদের প্রশমন সেবা এবং মা-বাবার মনোবল দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার জরুরী হয়ে দেখা দেয়। এইসব শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আশিকের অন্যান্য কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের মে মাসে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট (পিসিইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবার জন্য এ ধরনের কেয়ার ইউনিট এটাই প্রথম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

নিরাময়ক্ষীণ শিশুদের জীবনের শেষ দিনগুলোয় প্রশমন সেবা, ব্যথা নিরাময় চিকিৎসা ও বিভিন্ন উপসর্গের যত্ন নেয়ার বিষয়ে পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও দরকার মত পিসিইউতে প্রশমন চিকিৎসা পরিচালনা করা। সেই সাথে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে শিশু ও তার পরিবারকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি প্রদান করাই এই কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও আশিকের উদ্দেশ্য হলো-দেশ ব্যাপী ডাক্তার, নার্স, সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষের মাঝে প্রশমন সেবার ধারণা পৌছে দেয়া, যাতে করে ক্যান্সার সম্বন্ধে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্যান্সার আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগীতা পেতে পারে।

আশিক প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সেবা ও সুবিধাসমূহ ঃ

- ৯ শয্যা বিশিষ্ট পারিবারিক উন্নত পরিবেশে থাকার সুব্যবস্থা।
- ২৪ ঘন্টা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্স ও সমাজকর্মী দ্বারা সমন্বিত সেবা প্রদান।
- শিশুদের বিভিন্ন উপসর্গের নিয়মিত চেক-আপ করা সহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ সুবিধা।
- শিশুর পিতা-মাতাকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান।
- বিভিন্ন খেলনা, টিভি, ভিসিডির মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা।
- পিসিইউতে ভর্তিকৃত রোগী যদি মারা যায় সেক্ষেত্রে এ্যাম্বুলেন্স সেবার মাধ্যমে নিজ গ্রামের বাড়ীতে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ভর্তির নিয়ম ঃ

ক্যান্সার আক্রান্ত যে সকল শিশুরা জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত, তাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সুপারিশকৃত কাগজ-পত্র এবং চিকিৎসাকালীন অন্যান্য পত্রাদি প্রদর্শন সাপেক্ষে পিসিইউতে ভর্তির জন্য বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারে কর্মীবৃন্দ ঃ পিসিইউতে জড়িত রয়েছে দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যান্সার ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, পেডিয়াট্রিক অনকোলজিষ্ট, জেনারেল প্র্যাকটিশনার, প্রশিক্ষিত নার্স এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিকেল সমাজকর্মী। এছাড়াও এখানে রয়েছে প্রয়োজনীয় স্বেচ্ছাসেবী কর্মী।

আশিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট ঃ বাড়ি নং ৫২, রোড নং ৩/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন ঃ ০২-৫৮৬১৩৫৯৪ মোবাইল ঃ ০১৫৫২১০০২৯৩

e-mail: info@ashic.org website: w.washic.org

হসপিস বাংলাদেশ

ক্রমবর্ধমান নিরাময় অযোগ্য রোগীদের কথা চিন্তা করে ডাঃ শাহীনুর কবীর গড়ে তোলেন হসপিস বাংলাদেশ নামক প্রতিস্থানটি। প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার নিজের বাসার গ্যারেজে ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়।

সীমিত পরিসরে শুরু করে কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি পুরো ঢাকা শহরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে হসপিস বাংলাদেশ ৪৬ জন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও নার্সিং এইড, ২ জন মেডিকেল সোসাল ওয়ার্কার, ১ জন ফার্মাসিষ্ট এবং ৫ জন পূর্ণকালীন প্যালিয়েটিভ কেয়ার ডাক্তারের মাধ্যমে সারা ঢাকা শহরে হোম কেয়ার সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির আছে একদল খন্ডকালীন ডাক্তার যারা বিভিন্ন জরুরী অবস্থায় এলাকা বিশেষে রোগীদের ভিজিট করে থাকেন।

হসপিস বাংলাদেশের সেবার মধ্যে আছেঃ

হোম কেয়ারঃ ২৪ ঘন্টা বাসায় নার্সিং ও অনকল ডাক্তার সুবিধা।

শেয়ারড কেয়ারঃ এক্ষেত্রে রোগীর পক্ষ থেকে একজন কেয়ারগিভার দেওয়া হয় এবং তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ার নার্স তাকে ফলোআপ করে থাকে।

ওপিডিঃ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

হসপিস এমকেয়ারঃ এটা প্যালিয়াটিভ হোম হেল্‌থ কেয়ার সমাধান মোবাইল অ্যাপ্স।

টেলিকেয়ারঃ এটা প্যালিয়েটিভ টেলিফোনি সমাধান।

যদিও হসপিস বাংলাদেশ এখনও সারা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত পরিসরে তাদের হোম কেয়ার সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে তবে তাদের সেবার পরিসর দিন দিন বাড়ছে এবং অদুর ভবিষ্যতে একটি বিশেষায়িত প্যালিয়েটিভ কেয়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আস্থা ঃ

আস্থা হল হসপিস বাংলাদেশের একটি চ্যারিটি কার্যক্রম যা গরীব রোগীদের দোরগোড়ায় সামাজিক অংশগ্রহনের ভিত্তিতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সার্ভিস।

'আস্থা' তে আছে একটি বিশেষায়িত প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল যা নার্স, ডাক্তার এবং মেডিকেল সোসাল ওয়ার্কার নিয়ে গঠিত এবং যারা রোগীর বাসায় গিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা দিয়ে থাকে। 'আস্থা' কার্যক্রমের মাধ্যমে প্যালিয়েটিভ রোগীদের জন্য দরকারী বভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রপাতি বিনাশর্তে ধার দেওয়া হয়। এছাড়া এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যথানাশক যেমন, মরফিন বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। 'আস্থা' কার্যক্রমটি মূলত সমাজের বিভিন্ন স্তরের দয়ালু ও মানবতাবাদী মানুষের সামাজিক ও আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলমান আছে।

বাংলাদেশ প্রশমন ও সহায়ক সেবা সংস্থা

বাংলাদেশ প্রশমন ও সহায়ক সেবা সংস্থা (বাংলাদেশ প্যালিয়েটিভ অ্যান্ড সাপোর্টিভ কেয়ার ফাউনডেশন) একটি বেসরকারি, আয়হীন কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা যেটি সর্বাঙ্গীণ ও সহানুভূতিশীল যত্ন প্রদান করে থাকে সে সব মানুষদের যারা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত আমরা শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদেরকেও স্বাস্থ্য সেবা এবং কাউন্সেলিং দিয়ে থাকি। শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং তাদের পরিবারকে যারা

হাসপাতালে থাকে কিংবা হাসপাতালের বাইরে থাকে তাদের কে সংহত উচ্চমান সম্পন্ন প্রশমন ও সহায়ক সেবা, পারিবারিক যত্ন এবং ডে কেয়ার সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা আমাদের রোগীকে এবং এর পাশাপাশি তাদের যত্ন প্রদানকারীদেরকেও কাউন্সেলিং সেবা দিয়ে থাকি। ২০১০ সালে বাংলাদেশ প্যালিয়েটিভ অ্যান্ড সাপোর্টিভ কেয়ার ফাউনডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় সব ধরনের যত্ন প্রদানের জন্য। ডা. রুমানা দৌলা, বাংলাদেশ প্যালিয়েটিভ অ্যান্ড সাপোর্টিভ কেয়ার ফাউনডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারপারসন, যার লক্ষ্য হলো প্রশমন সেবা সৃষ্টি করা যেটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে গৃহীত, যথাযথ, টেকসই এবং সাশ্রয়ী মূল্যের হবে। বছরের পর বছর ধরে দলীয়ভাবে, আমরা আমাদের সেবাকে সম্প্রসারিত করেছি রোগীর জন্য এবং তাদের যত্ন প্রদানকারীর জন্য যেন তাদের যন্ত্রনা কিছুটা হলেও কমানো যায় এবং যে কোন বয়সে, যে কোন পর্যায়ে, যে কোন প্রসঙ্গের মধ্যে তাদের জীবনের মান উন্নত করতে পারে।

ফোন নাম্বারঃ ০১৭১৩০৬৪৪৬৫
ইমেইল ঠিকানাঃ bdpallcare@gmail.com
ওয়েব ঠিকানাঃ www.bdpallcare.com
প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ ঠিকানাঃ
সিম্পল ট্রি আনারকলি,
লেভেল-১২, ৮৯ গুলশান এভিনিউ,
ঢাকা- ১২১২ , বাংলাদেশ ।

ভাল খবর যে কোন সময় বলা যায়, কিন্তু খারাপ খবর বলতে হয় চিন্তাভাবনা করে। –

- সিডনি স্মিথ

যোগাযোগ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

চিকিৎসা সেবা যার পেশা তার সমব্যথী মনোভাবাপন্ন হওয়া যে কতটা জরুরী, তা বিস্তারিত বলার কোন অবকাশ নেই। মূলতঃ সেটি কেন্দ্রবিন্দু। অন্য মানুষের কষ্ট বোঝা এবং তার জন্য কিছু করতে চাওয়া মানুষের একটি বিরাট গুণ, বিশেষ করে যারা মেডিকেল বিদ্যাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে তাদের জন্য এটি অপরিহার্য। মানুষের অনেক গুণের মধ্যে সমবেদনা অন্যতম। একটি বিশুদ্ধ আত্মার পরিচায়ক। যারা স্বাস্থ্য পেশার সাথে জড়িত তাদের জন্য মমতা শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, চুলচেরা বিশ্লেণের একক এবং নিতান্ত জরুরী।

রোগী ও তার পরিবারের সাথে ভালো যোগাযোগের মাধ্যমে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের কিছু গুণাবলি এবং মানসিক দক্ষতা রপ্ত করা এবং প্রতিনিয়ত সেগুলো ব্যবহার করা দরকার। এ দক্ষতাগুলো খুবই সাধারণ আর রপ্ত করাও অনেক সহজ, যেগুলো প্রমাণ করবে যে আপনি তাদের কথা শুনছেন এবং তাদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত রয়েছেন।

যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক মানুষ তাদের চিন্তা, চেতনা এবং অনুভূতি আদান প্রদান করে যাতে একটি সাধারণ বোঝাপড়া তৈরী হয়। এর ফলে দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে একটি একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

যোগাযোগ বলতে আসলে একটি বার্তাকেই বোঝায়। একজনের কাছ থেকে অপরজনের কাছে বার্তার আদান প্রদানকে বোঝায়।

যোগাযোগ হতে পারে দুইভাবে, যেমন-

- মৌখিক বক্তব্য বা ভাষাগত
- ভাষাহীন যেমনঃ
  - ১. স্পর্শ
  - ২. শারীরিক অবস্থা বা ভঙ্গিমা
  - ৩. চোখের মাধ্যমে

অনেক রোগী আগন্তুকের সাথে কথা বলতে বিব্রত বোধ করেন। তারা ভাবতে পারেন যে আর কেউ বোধহয় তাদের মতো ভাবে না। তারা আরও ভাবতে পারেন

যে ব্যক্তিগত দুঃখ বা সমস্যার কথা অন্যকে বলা এক ধরণের অসুস্থ হয়ে পরা, পাগলামি করা বা দুর্বলতার লক্ষণ। অনেকে নিজেড় প্রতি দোষ চাপান তাদের অনুভূতির জন্য। এটা জরুরী যে পুরো কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের বদ্ধমূল ভুল ধারণা ভাঙ্গতে হবে। আপনি তাদের বলতে পারেন যে

- অনেক মানুষই একই ধরণের কষ্ট পায়। এ কথাটি দ্বারা তাদের সমস্যাকে আপনি আমল দিলেন। এর মানে আপনি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তাদের অনুভূতিগুলো বোঝা সম্ভব। তবে এটা বলা উচিত না যে, "আমি বুঝি আপনি কিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন।" যদিও আপনি তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমলে নেওয়ার জন্য কথাটা বলেছেন, তবে হিতে বিপরীত হতে পারে, তারা হয়তো আপনাকে অবিশ্বাস করা শুরু করতে পারে।
- আপনি একটি কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমি অবাক হবো না যে আপনি খুবই উদ্বেগ অনুভব করছেন।

যোগাযোগের মূল বিষয়গুলোঃ

১। নিজের পরিচয় দিন

২। আপনার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ একপাশে সরিয়ে রাখুন। রোগীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের উপর শ্রদ্ধাবোধ রাখুন। যদিও এটা অনেক সময় কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যখন আপনি তাদের বিশ্বাস বা মূল্যবোধের সাথে একমত হতে পারবেন না। আপনি কখনোই রোগী বা পরিবারকে বিচার করতে যাবেন না, তারা আপনাকে যাই বলুক না কেন।

৩। রোগীকে উপদেশ দিবেন না। উপদেশ দেয়া এবং জরুরী বা সাহায্যকারী তথ্য দেয়া এক নয়। সাধারণত উপদেশ দিতে সবাই চায়। একজন রোগী যিনি নিদারুণ আশাহীনতা এবং বিষণ্ণতায় ভুগছেন, তখন সমস্যার সমাধান হিসেবে কিছু বলা সাধারণ, কিন্তু কখনই সরাসরি কোন উপদেশ দিবেন না। আপনার উপদেশের উপর নির্ভর করে চললে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে অপারগ হবে। একজন কেউ যে কিনা তার সব কথা নির্বিচারে একান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, এমন পূর্ব অভিজ্ঞতা আপনার রোগীর নাও থাকতে পারে, যার ফলে তিনি আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবেন।

৪। যথার্থ পরিবেশ তৈরি

রোগীর সামনা-সামনি একই সমান্তরালে বসুন। নীরব পরিবেশ সৃষ্টি করুন। রোগী ও পরিবারকে ব্যথাবিহীন এবং আরামে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। চোখে চোখ রাখা, সহজ ভঙ্গিতে বসা, হাত গুঁটিয়ে বুকের কাছে না রাখা, শক্ত হয়ে বসে না থাকা বা রোগীর দিক থেকে ঘুরে না বসা, প্রয়োজনে মাথা নাড়া, মুখমন্ডলে দুঃখের ভাব আনা যখন রোগীর চোখ দিয়ে পানি পরছে, যথাযথ কিছু শব্দ করা যেমন - হুম, ঠিক আছে, আচ্ছা ইত্যাদি। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে সামাজিক ভিন্নতার ব্যাপারগুলো।

৫। রোগী কি জানতে আগ্রহী?

রোগী তার রোগ সম্পর্কে অনেক সময় অবগত থাকে আবার দেখা যায় অনেক রোগী তার কী রোগ তা জানে না। তাই রোগী যদি তার রোগ সম্পর্কে জানতে চায় বা জানতে আগ্রহী থাকে তাহলে ঐ রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে জানানো যায়। কিন্তু যে রোগী নিজের রোগ সম্পর্কে জানতে না চায় তাকে জোর করে জানানো অনুচিত। তিনি শুনতে চাচ্ছেন কিনা তা আগে জেনে নেবেন। যিনি শোনার জন্য প্রস্তুত নন, তাকে জোর করে তথ্য দেবেন না। কেউ জানতে আগ্রহী হলে তার কাছে তথ্য গোপন করবেন না। মিথ্যা বলবেন না।

৬। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

রোগীর কথা শোনা রোগীর সাথে কথা বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোগী নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, রোগী স্বস্তি পান। কিছুক্ষণের জন্য হলেও একাকিত্ব ও ভয় কেটে যায়। কথোপকথনের সময় হঠাৎ থেমে যাওয়া বা নিরবতা অনেক সময় অস্বস্তির জন্ম দেয়। এ ক্ষেত্রে

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা এবং আলাপাচারিতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা উচিত। একজন মানুষ সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ২২৫টি শব্দ বলে থাকে। কিন্তু আমরা প্রতি মিনিটে ৫০০ শব্দ শুনতে পারি। একজন মানুষের প্রতি মনোযোগ দিতে পরিশ্রম ও শক্তির দরকার, আর যখন তা করা যায় না তাকে একটি ভালো যোগাযোগ বলা যায় না। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, "তোমার মুখ যদি খোলা থাকে, তবে তুমি শিখতে পারবে না।" আমরা অনেক সময় ভাবি যে যখন আমি কথা বলতে থাকব তখন আমার কন্ট্রোল থাকবে। আমার এমন কিছু শুনতে হবে না যা আমি শুনতে চাই না। আমি হবো সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সবসময় তা হয়না।

যোগাযোগের মুহূর্তটিতে আপনি সেখানে উপস্থিত থাকুন। শুধুমাত্র শারীরিক উপস্থিতি নয়, মানসিক দিককে এর সাথে যুক্ত করুন।

শুধুমাত্র মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখা বা দরজার বাইরে - বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ লিখে রাখলেই ভালো যোগাযোগ করা যায় না। মনে মনে কিছু সময় আগে অফিসে কারো সাথে ঘটে যাওয়া বাকবিতন্ডা বা পরিবারের কারো সাথে কথা কাটাকাটির ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে থাকলে এই মুহূর্তের যোগাযোগকে ব্যহত করবেই। একসাথে অনেকগুলি কাজ করতে যাবেন না। কখনই মনকে ভাগ করে অর্ধেক বর্তমানে আর অর্ধেক অন্য কোন সময়ে, অতীত বয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে যাবেন না। মানুষের ব্রেন এমনভাবে তৈরি যা শুধুমাত্র একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে। যদি কোন কারণে এই মুহূর্তে যোগাযোগ করার মত সময় বা ধৈর্য আপনার না থাকে তাহলে এখন তা করতে যাবেন না।

৭। রোগীকে বুঝতে চেষ্টা করুন

স্টিফেন কোভে বলেছেন, "বেশীর ভাগ মানুষই বোঝার ইচ্ছা নিয়ে শোনেনা। আমরা শুনি উত্তর দেয়ার জন্য।" প্রতিটি যোগাযোগকে এমনভাবে নিতে হবে যে আপনি নিজে তা থেকে কিছু শিখবেন। আপনার ব্যক্তিগত মতামতকে একপাশে সরিয়ে রাখুন। তাতে করে দ্বিতীয় বক্তা তার মনের গহিনের ভাবগুলো খুব সহজেই আপনার সাথে ভাগ করে নিতে পারবেন। যদি তার কোথা আপনার মতের সঙ্গে না মেলে, আপনি কখনই আপনার মতামতের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেবেন না। বিল নিয়ে বলেছেন, "যার সাথেই আপনার নতুন পরিচয় হোক না কেন, প্রত্যেকের কাছেই আপনি নতুন কিছু শিখবেন।" আসলে সাত বিলিয়ন মানুষের প্রত্যেকেই কোন না কোন কিছুতে দক্ষ। আপনি যখন শারীরিক উপসর্গের কথা শুনছেন, তখন এর পরিষ্কার চিত্র পাওয়ার জন্য রোগীকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতে পারে। রোগী যদি নিজে বলতে পারেন তাহলে রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার উপসর্গের কথা। যেমন: বমি কতদিন ধরে বা বমি দিনে কয়বার হয় ইত্যাদি। রোগীকে যে আপনি বুঝতে পারছেন তা বোঝানোর জন্য আপনি মাথা নাড়াতে পারেন এবং ছোট ছোট মন্তব্য করতে পারেন।

৮। কথা বলার সময়:

শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হোন। কঠিন ভাষা পরিহার করুন। তারা যে বুঝতে পেরেছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিন। পরামর্শ দেয়ার

চাইতে তথ্য দিন। আপনি কোন কিছু না জানলে তা স্বীকার করতে লজ্জা বা ভয় পাবেন না। না জেনে ভুল তথ্য পরিবেশন করা একটি অপরাধ। তাদের উৎসাহিত করতে হবে এমন কোন কিছু করার কথা ভাবতে যাতে তারা নিজেদের কোন সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে পারেন যা তারা নিজেরাই ব্যবহার করতে পারেন। আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাদের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করবেন না। যদি তারা তাদের কোন নিকটত্মীয় হারানর কথা বলতে থাকে এই ব্যাপারে আপনার নিকট কেউ মারা যাওয়ার সময় কেমন লেগেছিল তা বর্ণনা করতে যাবেন না। অভিজ্ঞতা কখনো এক রকম হয় না। সব অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিগত। আর সবচেয়ে বড় কথা এটা আপনাকে নিয়ে নয়। ঐ কুহুরতে আপনার এটা প্রমাণ করার কোন দরকার নেই যে আপনি কত চমৎকার একজন মানুষ অথবা আপনি কত কষ্ট সহ্য করেছেন। যোগাযোগ মানে দর হাকানোর সুযোগ না।

৯। সমমর্মী হওয়া

সমমর্মিতা এবং সমর্থন প্যালিয়েটিভ কেয়ার এর একটি বড় অংশ।

আপনি সমমর্মিতা দেখাতে নীচের উক্তি **গুলো ব্যবহার করতে পারেনঃ**

“ঘটনা শুনে মনে হচ্ছে এটা খুবই ভয়ানক/ভীতিকর ছিলো আপনার জন্য”

“আপনার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি এটা কত কষ্টের ছিল”

“আপনি অনেক **কষ্ট সহ্য করেছেন”**

“আপনার অনেক কঠিন অভিজ্ঞতা আছে”

“আমি বুঝতে পারছি কত দুঃখের/ভয়ের ছিল এটা আপনার জন্য”

- আপনি এইমাত্র যা বর্ণনা করলেন তা এ ধরণের অবস্থায় একজন মানুষের সাধারণ প্রতিক্রিয়া।
- আমি অনেকের সাথে কাজ করেছি যারা একই ভাবে তাদের কষ্ট বর্ণনা করেছে।
- যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া আপনি বর্ণনা করেছেন তা প্রায়ই দেখা যায়।
- আমি আপনার ভয় দেখে অবাক হইনি।

১০। আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

১১। নিজে তৈরী থাকুন

আগে থেকে প্রস্তুত হোন। রোগীর রোগ ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বইপত্র, সহকর্মী, চিকিৎসক ও দলের অন্যদের সাথে আলাপ করে বিস্তারিত জানুন যেন কেউ কিছু জানতে চাইলে আপনি উত্তর দিতে পারেন। যদি তাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে তা শোনা এবং সঠিক উত্তর দিতে হলে পূর্ব-প্রস্তুতি দরকার। স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের রোগী ও তার পরিবারের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদা সম্পর্কে জানা এবং তা পূরণের আগ্রহ থাকতে হবে। অনেক সময় হতে পারে এ চাহিদাগুলো নিয়মিত সামাজিক বা ধর্মীয় প্রকাশের বাইরে। এমনকি তা পরিবারের প্রতি সদস্যের ক্ষেত্রে, শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে আত্মিক চাহিদা ও অভিজ্ঞতা আলাদা বা অদ্ভুত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যা দরকার তা হল, প্রত্যেককে তাদের আত্মিক চাহিদা ও অভিজ্ঞতার তথ্য নেয়া ও প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া। বই, ভিডিও, কবিতা বা প্রার্থনা এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। ইন্টারনেটে এ সব কিছুর প্রচুর ভাণ্ডার রয়েছে। রোগীর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী কাজগুলো সম্পর্কে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে আগে থেকে ভাবতে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। যেমন, একজন মুসলমানের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে দাফন করতে হবে। কবর কোথায় হবে, চারদিনের মিলাদ, চল্লিশা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় খুঁটিনাটি রীতি পারতপক্ষে কেউ বাদ দেবে না। শুধুমাত্র আগে থেকে ভেবে সিদ্ধান্ত নিলে অনেক ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

১২। পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে একত্রে বসুন।

রোগীর পরিবারের লোক এবং আত্মীয় স্বজন রোগীর রোগ ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে অব্যশই তা জানানো দরকার। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক সভা (Family meeting) ভাল একটি ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের প্রত্যাশা জানুন। কোনটি বলা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করুন। জ্ঞান বিনিময় করুন। প্রত্যেক মানুষের আবেগ-অনুভূতি ভিন্ন। শুধুমাত্র তার জন্যই প্রযোজ্য। কোনো বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করা যাবে না। কখনোই বলবেন না যে "আমাদের কিছুই করার নেই।" অনেকে ভাবে যে তার ব্যক্তিগত যে কোন কাজের প্রভাব শুধুমাত্র তার ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করবে, আসলে ধারণাটি ভুল। প্রত্যেক মানুষের কাজের ঢেউ সুদূরপ্রসারী তরঙ্গের মতো প্রভাব ফেলে।

১৩। খোলামেলা প্রশ্ন ব্যবহার করুন।

আপনার প্রশ্ন শুরু করতে পারেন " কে, কি, কখন, কোথায়, কেন অথবা কেমন" শব্দগুলো দিয়ে।

খোলামেলা কথা বলার জন্য রোগীকে প্রশংসা করতে পারেনঃ

রোগী তার ব্যক্তিগত কঠিন কোন বিষয় নিয়ে কথা বললে তাকে ধন্যবাদ দিলে বা প্রশংসা করলে রোগী আরাম অনুভব করবে। যেমনঃ "ধন্যবাদ এটা আমাকে বলার জন্য"

"আপনি খুবই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আপনার আন্তরিক অনুভূতি আমাকে বলে"

রোগী ও তার পরিবারের প্রদত্ত সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করুন। রোগীর কষ্টকর অভিজ্ঞতাগুলো ফাইলে লিখে নিরাপদ একটি তালাবদ্ধ স্থানে যেমন- ফাইল কেবিনেটে, রক্ষা করা দরকার।

১৪। একটি অত্যন্ত জরুরী দক্ষতা হলো, রোগীর উদ্বেগ নিয়ে কথা বলা। রোগীর অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করুন। উদ্বেগের প্রধান কারণ অনিশ্চয়তা, ভয়, হতাশা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি। রোগীদের কিছু কিছু ছোট পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করুন। শেষ পর্যায়ের রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা খুব বেশি দেখা যায়। অনিশ্চয়তা ভুলভাবে উদ্দেশ করলে রোগীর অবস্থার অবনতি হতে পারে। রোগীর সঙ্গে একত্রে বসে প্রার্থনা করা যথার্থ হবে কিনা তা ঠিক করুন। আবার খুব বেশী জড়িয়ে পড়ে রোগীর কষ্ট নিজের কষ্ট মনে করাও ভুল। এটি আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিতে পারে এবং আপনার নিজেকে কষ্টে ফেলতে পারে। একটি ফলপ্রসূ মতবিনিময় ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলো বোঝার অন্যতম চাবিকাঠি। এই কথোপকথন পরিবারের সাথে সরাসরি অথবা একই ধর্মীয় বা সংস্কৃতির নেতাদের সাথে হতে পারে। অনেক সময় রোগী ও পরিবারকে সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা থাকতে পারে। এর মধ্যে যোগাযোগের ধরণ, ভাষা, পরিবারের অন্য কোন চিন্তা বা ভয় হতে পারে। এ সকল উদ্বেগ শ্রদ্ধা ও নম্রতার সাথে মোকাবেলা করা জরুরী।

বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার কোথায় পাওয়া যায়?

২০০৭ সালে একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্যালিয়েটিভ কেয়ারের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ২০১৬ সালে জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউটে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ সেবার উন্নতিকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

প্রত্যেককে বানানো হয়েছে নির্দিষ্ট কাজের জন্য এবং প্রত্যেক হৃদয়ে সেই কাজটি করার আকাঙ্ক্ষাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে

- রুমি

গৃহ সেবা

প্যালিয়েটিভ গৃহসেবা কেন দরকার?

প্যালিয়েটিভ গৃহসেবার জীবন সংশয়ী মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে বিশিষ্ট ভারতীয়-আমেরিকান চিকিৎসক ও লেখক অতুল গোয়ান্ডের 'Being Mortal' বইতে লেখকের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। তার কন্যার পিয়ানো শিক্ষিকা, পেগ একধরনের ব্যতিক্রমধর্মী মাংসপেশির ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পরেন। পরবর্তীতে সম্ভাব্য সব চিকিৎসা নেয়া শেষ হয়ে গেলে, তীব্র ব্যথা ও মানসিক অবসাদে ভোগা অবস্থায় তিনি অতুলের শরণাপন্ন হন। অতুল তাকে হসপিস কেয়ার শুরু করতে বলেন। ভদ্রমহিলা জীবনের আনন্দের সব আশাভরসা ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছিলেন। তবে অতুলের চমৎকার শক্তিশালী লেখনীর মাঝে আমরা জানতে পারি হসপিস কেয়ারের মাধ্যমে কি করে পেগ তার জীবনের শেষ সময়গুলো পরম সার্থকভাবে কাটাতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তার জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা তার সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীদের সাথে জীবনের একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত ভাগ করে যেতে পেরেছেন, যা পড়ে আমরা বুঝি প্যালিয়েটিভ কেয়ার একজন শেষ পর্যায়ের রোগীর জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত। আরেকটি সমসাময়িক বই 'Tuesdays with Morrie'। এখানে লেখক মিচ অ্যালবম তার প্রিয়তম সোসিওলজীর শিক্ষক প্রফেসর 'মোরি' -কে খুঁজে পান বহু বছর পরে, শেষ রাতের একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে। গ্রাজুয়েশন দিনে মিচ তার প্রিয়তম শিক্ষক 'মোরি'-কে কথা দিয়েছিলেন তার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। কিন্তু জীবনের বাস্তবতার স্রোতে নিষ্ঠুর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেকে তৈরী করার মধ্যে দিয়ে কখন যেন সে কথা হারিয়ে যায়। অনেক বছর পার হয়ে যায়, তখন তিনি বিশ্বখ্যাত একজন স্পোর্টস লেখক-সাংবাদিক। টিভি উপস্থাপক 'মোরি'র সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। 'মোরি' তখন একটি কঠিন নিরাময়হীন রোগ 'Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)'-এ আক্রান্ত, যা আর ভালো হবার নয়। শিক্ষকের সাথে এরপর যেদিন মিচের দেখা হলো, সেদিন ছিল মঙ্গলবার। তিনি মোট ১৪টি মঙ্গলবার তার প্রিয়বন্ধুসূলভ শিক্ষককে দেখতে ডেট্রয়েট থেকে বস্টনে যান আকাশ পথে। আর প্রতি মঙ্গলবারের তাদেরও সাক্ষাতের আলপচারিতা এই বইয়ের মুল বিষয়বস্তু। পরবর্তীতে মিচ প্রতি

মঙ্গলবার 'মোরি'র সাথে দেখা করতো এবং শিক্ষকের চিকিৎসার বিশাল ব্যয়ভার বহনের জন্যই এই বইটি লেখেন। ২০০০ সালে নিউইয়র্ক টাইমস বেসসলার এ বইতেও আমরা জানি কিভাবে হস্পিস সেবার মাধ্যমে বাড়িতে থেকে 'মোরি' নিজের পছন্দমত জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত উপভোগ করেছেন।

প্যালিয়েটিভ গৃহসেবার মাধ্যমে সম্পূর্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব। চিকিৎসাসেবীদের জন্য প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাজ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে যাতে তারা রোগী এবং রোগীর পরিবারের গৃহসেবায় নিজেকে যুক্ত করতে পারে এবং সমাজ ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ গৃহসেবা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক, নার্স, সমাজকর্মী ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার সহকারীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দল গঠন করা যায় যাদের মাধ্যমে মূল সেবাটি প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুরারোগ্য মানুষ ও তার পরিবারের সংকটময় মুহূর্তে একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসাসেবীর মমতাময় উপস্থিতির ব্যবস্থা করাই গৃহসেবার মূল লক্ষ্য।

বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সংক্রামক ব্যধির পাশাপাশি ছোঁয়াচে নয় এমন রোগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে এখন অসংক্রামক রোগগুলো শারীরিক অক্ষমতার প্রধান কারন, যেগুলো মোট মৃত্যুর ৬০ ভাগের জন্য দায়ী, এবং যার মধ্যে ৮০ ভাগ মৃত্যুই গরীব ও মধ্যম আয়ের দেশ গুলোতে ঘটে থাকে। রোগের ব্যাপ্তি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করে বলা যায় যে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপি ৪ কোটি লোকের প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন।প্রায় ২ কোটি লোকের মৃত্যুর পূর্ববর্তী সময়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার দরকার, যার মধ্যে ১.৮ কোটি লোক এই সেবা থেকে বঞ্চিত ।

গত ২৩শে মে ২০১৪ সনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা কর্তৃক জেনেভাতে আয়োজিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের বার্ষিক সাধারন সভায় প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ক সিদ্ধান্ত, WHA67.19, গ্রহণ করা হয়। এই কমিটি আহ্বান করে যে, প্রতিটি দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সব পর্যায়ে যথার্থ তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক ও স্বল্প মূল্যে রোগীর জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পাশাপাশি প্রাথমিক সেবা, সমাজভিত্তিক ও গৃহভিত্তিক সেবার এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিটি জোর প্রদান করে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি স্বীকৃত মানবাধিকার।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার দীর্ঘস্থায়ী অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের কষ্ট কমায়, এবং জীবনের মান উন্নয়ন করে। এটি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী

রোগে আক্রান্ত, অসুস্থ প্রান্তিক বৃদ্ধ এবং এইডসে আক্রান্ত রোগীদের জীবনের মান উন্নয়ন করে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আত্মিক দিকগুলো প্রভাবান্বিত করে, এবং প্রয়োজনে মৃত্যু পরবর্তী সেবা পর্যন্ত দিয়ে থাকে। এটি রোগী কেন্দ্রিক, রোগ কেন্দ্রিক নয়। হাসপাতালে অন্তবিভাগে, বহি:বিভাগে, এমন কি রোগীর বাসায় এবং হসপিসে প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করা যায়।

অনিরাময়যোগ্য অথবা প্রান্তিক রোগে আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগীই জীবনের শেষ দিন, মাস কিংবা বছরগুলো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পার করেন। অনিরাময়যোগ্য এবং দূর্বল করে এমন রোগে আক্রান্ত রোগীরা অনেক যন্ত্রনায় ভুগে থাকেন। ব্যথা, অন্যান্য অনেক উপসর্গ (যেমন শ্বাসকষ্ট, বমি ভাব ও বমি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত, সংক্রমিত ঘা ইত্যাদি) ব্যক্তির জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলে। শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি তারা সামাজিক, মানসিক, আর্থিক, এবং আধ্যাত্মিক সমস্যায় ভোগেন।

জীবনের শেষ সময় গুলোতে অসুস্থ রোগীর পাশে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকে তাই এধরনের রোগীর সেবায় বাংলাদেশে সমাজভিত্তিক প্যালিয়েটিভ গৃহসেবার কথা ভাবা হয়। এই সেবা ক্লিনিক, রোগীর বাসায় (ব্যক্তিগত বাসভবন সহ নার্সিং হোম) এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেওয়া যায়। যখন রোগী হাসপাতাল থেকে বাসায় যান তখন এই সমাজভিত্তিক প্যালিয়েটিভ সেবা কার্যক্রম হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের সাথে সংযুক্ত থেকে রোগীর সার্বিক সেবাকে চলমান রাখে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জর্ডান, নেপাল, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, আলবেনিয়ার মত কম সম্পদশালী দেশগুলোতে রোগীদের জন্য এই সমাজভিত্তিক কার্যক্রম অধিকতর সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী। মালয়েশিয়ার "সারওয়াক প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রোগ্রাম" দেখিয়েছে যে কেন্দ্রীয় হাসপাতালের প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রমের সাথে ভালো যোগাযোগই একটি ভালো সমাজভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারে, যদিও সেটা দূরের কোন এলাকায়ও হয়। "কিং হোসাইন ক্যান্সার সেন্টারে" জর্ডান প্রকল্পের প্রদর্শনী ফলাফল দেখা যায়ঃ

১. ব্যথার ব্যবস্থাপনা সহজতর করার জন্য আফিম জাতীয় ঔষধ প্রেসক্রিপশন নিয়ন্ত্রক আইন পরিবর্তন।
২. জাতীয় আফিম কোটা এবং ব্যবহার বৃদ্ধি করা
৩. প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ
৪. পরামর্শের জন্য সমাজের নেতাদের সনাক্ত করা।

বিভিন্ন পেশার লোক দ্বারা গঠিত একটি প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল যার প্রধান লক্ষ্য হল রোগী এবং রোগীর পরিবারের যন্ত্রণাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা প্রতিরোধ করা এবং কমানো। শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক যন্ত্রণাগুলোকে নির্ণয় করে সেবা প্রদান করা। রোগের অগ্রগতি, পূর্বাভাস, এবং বিভিন্ন চিকিৎসা সেবার সুবিধা এবং অসুবিধা গুলোই প্যালিয়েটিভ গৃহসেবা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, পাশাপাশি রোগীর লক্ষ্য, মূল্যবোধ, এবং পছন্দসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সংরক্ষণ করা হয়।

কেরালা মডেলঃ

ধাপ ১- সংবেদনশীলতাঃ

যেকোন এলাকাতেই কিছু মানুষ থাকে যারা অন্যের সাহায্য করতে আগ্রহী থাকেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে সাহায্যে করে যান। যেসব রোগী নিরাময় অযোগ্য রোগে ভুগছেন তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে সেসব মানুষকে সচেতন করা এবং যতটা সম্ভব তাদের একত্র করা। প্রথম ধাপ হলো যারা আগ্রহী তাদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা বা সভা করা। এটা স্থানীয় কোন দলনেতার দায়িত্ব, এমন আলোচনা সভা আয়োজন করা। সকল দল বা সংস্থা যারা সামাজিক এবং স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে জড়িত ঐ এলাকাতে তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো। স্থানীয় 'নিরপেক্ষ' এই দল বা সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যেন বিভিন্ন দল বা সংস্থা ঐ এলাকায় অনুষ্ঠিত সভায় যোগ দিতে পারেন। ঐ এলাকার নিরাময় অযোগ্য অসুস্থ বা শয্যাশায়ী রোগীর বিষয়ে বুঝিয়ে বলা। রোগীদের সহায়তার জন্য সম্ভাব্য সব উপায় নিয়ে আলোচনা করা। সেই সব রোগীদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের নিবন্ধন করতে হবে।

ধাপ-২: একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করাঃ

একটি সমাজ ভিত্তিক প্যালিয়টিভ গৃহসেবা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া।

ধাপ-৩: আগ্রহী দলকে প্রশিক্ষণ দেয়াঃ

তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া যারা প্রাথমিক পর্যায়ের নার্সিং সেবা এবং যোগাযোগ দক্ষতা বা মানসিক সমর্থন সম্পর্কে শিখতে আগ্রহী। প্রশিক্ষণটি স্থানীয়ভাবে আয়োজন করা এবং এছাড়াও এমন ভাবে সময় ও জায়গা নির্ধারণ করা যাতে করে

বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারীর জন্য আসতে সুবিধা হয়। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তাদের আশেপাশের শয্যাশায়ী রোগী এবং নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করতে দিন (কোন উপযোগী ফর্ম ব্যবহার করুন যেমন: স্বেচ্ছাসেবকদের রোগী সেবার প্রোটোকল)। এটা খুবই জরুরী, সাপ্তাহিকভাবে এসব স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে একসাথে পর্যালোচনা সভায় বসা। এই পর্যালোচনা সভাতে সেসব সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা কিছু সামাজিক কাজকর্ম আরম্ভ করা যেমন অনাহারে থাকা পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা, রোগীর সন্তানদের পড়াশোনাতে সাহায্যে করা, রোগী এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য মানসিক সমর্থন প্রদান ইত্যাদি। তথ্য আদান প্রদানের জন্য একটি যোগাযোগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

একটি জায়গা নির্ধারন করা যেখানে একজন নতুন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করতে পারেন। অর্থ সংগ্রহ, লোকবল এবং অন্যান্য সম্পদ যোগাড় শুরু করা। যদি থেকে থাকে, তাহলে কাছাকাছি কোন প্যালিয়েটিভ কেয়ার কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা। এই এলাকার স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

ধাপ-৪: নার্সিং উপাদান:

পরবর্তী ধাপ হলো নার্সিং সেবা যুক্ত করা। এটা করতে ১-২ মাস সময় লাগতে পারে। স্থানীয় দলটির জন্য একটি স্থায়ী সামাজিক সমর্থন পদ্ধতি তৈরী করা এবং চারজন নার্স নিয়োগ দিতে অর্থ যোগাড় করা । নার্সকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে নিকটবর্তী কোন প্যালিয়েটিভ কেয়ার কেন্দ্রের নার্সের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, যদি পাওয়া যায়। নার্সের প্রোটোকল ব্যবহার করা যেভাবে নার্স নেতৃত্বে গৃহসেবাতে লেখা আছে। নির্ভূল তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তা পর্যালোচনা জরুরী।

ধাপ-৫: চিকিৎসা উপাদান:

প্রশিক্ষিত ডাক্তারের স্বল্পতার জন্য চিকিৎসা প্রাপ্তি খুবই কষ্টদায়ক। একটি সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে স্থানীয় কোন ডাক্তারের সাহায্যে নেয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাহায্যের জন্য। এই বিষয়ক তথ্য উপাদান এবং প্রকল্পের ডাক্তারের সহযোগীতা স্থানীয় ডাক্তারকে নিজে থেকে শিখতে আগ্রহী করবে। তাকে উৎসাহ দিতে হবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য।

ধাপ-৬: বহি: বিভাগ ক্লিনিক:

একবার যদি গৃহসেবা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন সেখানে নিয়মিত বহি:বিভাগ সেবা চালু করতে হবে। এর জন্য পূর্বশর্ত হলো প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্স প্রাপ্ততা। মনে রাখতে হবে যে, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (বহি:বিভাগ ক্লিনিক/অন্ত: বিভাগ সেবা) চালু করা, গৃহসেবা কার্যক্রম চালু করার চেয়ে, বেশি ব্যয় বহুল। স্থানীয় কোন হাসপাতালের সাথে যুক্ত হয়ে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যেতে পারে।

ধাপ ৭- মূল্যায়ন:

একটি নিয়মিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী করতে হবে। যেকোন প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা সহায়ক সেবাসমূহ স্থানীয় মানুষের সমর্থন পায়। এটা খুব জরুরী যে, ভাল কথা শুনে যেন আমরা আত্মহারা না হয়ে যাই। প্রতিমুহূর্তে উন্নতি করার সুযোগ কাজে লাগানোর মনোভাব থাকতে হবে।

ধাপ ৮- নতুন একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা প্রশিক্ষিত দল দ্বারা:

প্রশিক্ষিত দলের যারা ইতিমধ্যে কাজ বুঝে গেছেন, তাদের নিয়ে নতুন সেন্টারের উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, এবং কাছাকাছি কোন নতুন এলাকায় ১-৭ নং ধাপ অনুসরণ করে আবার কাজ শুরু করতে হবে।

"যদি তুমি সূর্যের মত উজ্জ্বল হতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমায় সূর্যের মতোই পুড়তে হবে।"

- এপিজে আবুল কালাম

দারিদ্র বিমোচন এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার

ভারতে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা যায় যে, প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রাপ্তি দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মুলতঃ অনর্থক ও ভয়ানক চিকিৎসা গ্রহণ কমানো এবং রোগী ও পরিবারের সদস্যদের কাজে ফিরে যেতে সাহায্যের মাধ্যমেই এটি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এই গবেষণায় দেখা যায়, প্যালিয়েটিভ কেয়ার গ্রহণ করছেন এমন রোগী ও পরিবারের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ, ওষুধ কেনা বা হাসপাতালে যাতায়াত বাবদ মাসিক খরচ কমে যায়, কারণ গৃহ সেবার মাধ্যমে রোগের উপসর্গের নিয়মিত চিকিৎসা, ঔষধ প্রাপ্তি। শতকরা ৩১ ভাগ রোগী প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রোগ্রাম হতে বিনা পয়সায় ঔষধ পেয়েছেন। এই গবেষণা আরেকটি চমৎকার তথ্য দিয়েছে। শতকরা ৮ ভাগ রোগী স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় পুনরায় আয় করছেন এবং ১০ ভাগ পরিবার কাজে ফিরে যেতে পেরেছেন 'Respite' বা সাময়িত বিরাম সেবার সুবিধা নিয়ে।

প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ তথ্যে জানা যায় যে, নিরাময়বিহীন রোগে আক্রান্ত মানুষ নিজ বাসায় সেবা নিতে চায়। কঠিন রোগে আক্রান্ত প্রতিটি রোগী ও তার পরিবারের চাহিদা আলাদা। দেখা গেছে, গৃহসেবা এধরণের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধরণের চাহিদা পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। ২০১১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র ৭টি হাসপাতাল ভিত্তিক প্যালিয়েটিভ কেয়ার কেন্দ্র আছে। তাই এই বিশাল জনগোষ্ঠির প্যলিয়েটিভ কেয়ারের চাহিদা পূরণের জন্য গৃহভিত্তিক প্যালিয়েটিভ ভূমিকা অপরিসীম। তাহলে যাদের এ সেবাটি নিতান্ত দরকার তারা কোথায় যাবে! কারা তাদের চিকিৎসা দেবে? তাই এ সেবাটি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সকল স্তরে দ্রুত যোগ করা নিতান্ত জরুরী। এ সেবাটি মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলার কথা এখনই ভাবতে হবে।

বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে গঠিত একটি প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল যার প্রধান লক্ষ্য হল রোগী এবং রোগীর পরিবারের যন্ত্রণাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা প্রতিরোধ করা এবং কমানো। শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং অত্মিক যন্ত্রণাগুলোকে নির্ণয় করে সেবা প্রদান করা। রোগের অগ্রগতি, পূর্বাভাস, এবং বিভিন্ন চিকিৎসা

সেবার সুবিধা-অসুবিধা যাচাই প্যালিয়েটিভ গৃহসেবা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে পাশাপাশি রোগীর লক্ষ্য, মূল্যবোধ, এবং পছন্দসমূহকে গুরুত্ব দেয়া এবং বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরনের রোগীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। উন্নত বিশ্বে প্রচলিত এই সেবা সীমিত পরিসরে বাংলাদেশেও চালু হয়েছে। ২০০৭ সালে দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ২০১৬ সালে জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউটে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারিভাবে ৩/৪টি প্রতিষ্ঠানে প্যালিয়েটিভ কেয়ার দেয়া হয়ে থাকে।

ভিন্নভাবে চিন্তা করার ও উদ্ভাবনের সাহস থাকতে হবে, অপরিচিত পথে চলার ও অসম্ভব জিনিস আবিষ্কারের সাহস থাকতে হবে এবং সমস্যাকে জয় করে সফল হতে হবে। এ সকল মহানুভবের দ্বারা তরুনদের চালিত হতে হবে। তরুণ প্রজন্মের প্রতি এই আমার বার্তা।

- এপিজে আবুল কালাম

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ভূমিকা

২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করাসহ উন্নয়নকে টেকসই করতে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র সর্বসম্মতভাবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (Sustainable Development Goals) বা এসডিজি গ্রহণ করেছে। ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি টার্গেটকে সামনে রেখে আগামী ১৫ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে এই এসডিজিতে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের ৯০ লাখ মানুষের মতামত নিয়ে এটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল। আরও উন্নত পৃথিবীর জন্য এটি এক সর্বজনীন, সমন্বিত ও রূপান্তরিত স্বপ্ন। একই স্বপ্ন প্যালিয়েটিভ কেয়ারের - তাৎক্ষণিক নয় টেকসই স্বাস্থ্য ও সেবা জীবন-সংশয়ী ও জীবন সীমিতকারী মানুষ ও তার পরিবারের জন্য।

১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ১) দারিদ্র বিমোচন, ২) ক্ষুধামুক্তি, ৩) সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ৪) মানসম্মত শিক্ষা, ৫) নারী-পুরুষ সমতা, ৬) বিশুদ্ধ পানি ও পয়োনিষ্কাশন, ৭) সহজলভ্য ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, ৮) উন্নত কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ৯) শিল্প, উদ্ভাবন ও পরিকাঠামো, ১০) বৈষম্য কমানো, ১১) টেকসই শহর ও সমাজ, ১২) দায়িত্বশীল উৎপাদন ও ব্যবহার, ১৩) জলবায়ুর জন্য পদক্ষেপ, ১৪) পানির নীচের জীবন ১৫) মাটির উপরে জীবন ১৬) শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, ১৭) লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারত্ব।

জাতিসংঘ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goals) বা এমডিজি সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০০ সালে গৃহীত এমডিজি বিশ্বের ৭০ কোটি মানুষকে দারিদ্রমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। এমডিজির আটটি লক্ষ্য পূরণে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র কমানোর পাশাপাশি ক্ষুধা, রোগ নিবারণ, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ এবং পানি ও পয়োনিষ্কাশনে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো কাজ করেছে। এমডিজি থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড়। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। নানা রকম চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার পরও এমডিজিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে। এমডিজির বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে সহায়তা করেছে।

বিশ্ব সম্প্রদায় অনেক বেশি জনমুখী ও একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটি অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এসডিজি মাঠে নেমেছে, যা প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অঙ্গীকারের সঙ্গে মেলে। আমাদের আর্থসামাজিক ও পরিবেশের ঝুঁকিগুলো একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোর পূর্ণ ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার সমন্বিতভাবে কাজ করতে তৈরী।

এসডিজির জন্য সামনে আরও ১৫ বছর পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ হলো। সবাই পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে। এটা অনস্বীকার্য যে এত বিশাল কাজ সম্পন্ন করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

জনগণ এখন আর কেবল উপকারভোগী নয়, তারা দেশের অংশীদার। যেকোনো কাজ তাদের সম্পৃক্ত করে করতে হবে। এখন দেশে পাঁচ কোটি যুবক। ২০৪১ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে ২১ কোটি, যখন যুবকদের সংখ্যা কমে যাবে।

এখনই দেশে সবচেয়ে বেশি তরুণ জনসংখ্যা। যুবকদের জন্য বিনিয়োগ করতে হলে এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। এসডিজি অর্জন করতে হলে যুবকদের গুরুত্ব দিতে হবে। ২০৩০ সালে তাঁর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশর জন্য এখনই ব্যাপক বিনিয়োগ করতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সুস্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি এবং জীবনঘাতী বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে শিশু ও প্রসূতি মায়ের মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে গত দুই দশকে অনেক সাফল্য এসেছে সারা বিশ্বে। উন্নতি হয়েছে সুপেয় পানি, স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, পোলিও এবং এইচআইভি এইডসের মতো রোগের বিস্তার প্রতিরোধে সাফল্য এলেও এসব রোগে মৃত্যু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বা আক্রান্ত রোগী ও পরিবারের নিদারুণ কষ্টের সমাধান হয় কম। স্তন ক্যান্সার ও শয্যাক্ষত নিয়ে ৭০ বছর বয়সি রহিমা একা ঘরে ধুকছেন। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনো রহিমাদের ঘরে গিয়ে সেবা দিতে তৈরী নয় । রহিমাদের কষ্টের নিরোধে কোন উদ্যোগ নেই।

২০১৩ সাল শেষে বিশ্বে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লাখ। এ সময়ে বিশ্বজুড়ে ২ লাখ ৪০ হাজার শিশু নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণের শিকার হয়েছে। আফ্রিকায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর প্রধান কারণই এইডস। আর সারা বিশ্বে এই বয়সের জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ এইডস। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধে অনেক সাফল্য এলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে এ দুটি রোগে মৃত্যুর হার এখনো বেশি।

এসডিজির লক্ষ্যসমূহ:

- ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুহার ৭০-এ নামিয়ে আনা (প্রতি লাখে)।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১২ ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৫-এ নামিয়ে আনা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি অবহেলিত উষ্ণমন্ডলীয় রোগ, হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসাব্যবস্থা জোরদার করা।
- ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বব্যাপী সবার জন্য উন্নত চিকিৎসা, ওষুধের সরবরাহসহ সর্বজনীন চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ু, পানি, মাটিসহ পরিবেশদূষণজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাঠামো অনুযায়ী বিশ্বের সব দেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা।
- বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক তৈরিতে গবেষণা কার্যক্রমে সাহায্য-সহযোগিতা বাড়ানো। ট্রিপস চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের জন্য ওষুধ ও প্রতিষেধক প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ। উন্নয়নশীল, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্য খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ বিশ্বের সব দেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঝুঁকি মোকাবিলার সামর্থ্য বাড়ানো।

কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না, যদি সঠিক তথ্য-উপাত্ত না থাকে। যারা তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করে, তাদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ ও দরকার রয়েছে বলে মনে করি। সময়মতো সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেলে যেকোনো পরিকল্পনা অনেক

বেশি কার্যকর হবে। আমরা সব সময় সমন্বয়ের কথা বলি। কিন্তু বাস্তবে প্রায় সব কাজে সমন্বয়হীনতা থাকে। আমাদের কেবল একটি অধিকতর টেকসই বিশ্বের নয়, বরং এমন এক বিশ্ব গড়ার বুনিয়াদ রচনা করতে হবে যেখানে বিরাজ করবে অধিকতর সমতা ও সুবিচার, যেখানে শুধু প্রতিকার বা প্রতিরোধ নয় সমানভাবে মনোযোগ পাবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং নিরাময়হিন রোগে আক্রান্ত মানুষ ও তাদের পরিবার। সমৃদ্ধি পৌঁছাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোকের কাছে, যারা আমাদের বসবাসের এই পৃথিবীটাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

মানুষের কল্যাণে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা করি। আমাদের দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের জন্য কল্যাণকর, এমন কিছু লক্ষ্য নিয়ে সবাই সমন্বিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জন করা কি অসম্ভব কিছু?

সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা অনেক কম। ২০১৪ সালে 'বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবস্থান নিরূপন' শীর্ষক নিপোর্টের একটি গবেষণায় অংশ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেখানে ইন্টারভিউ নেয়ার সময় এইডস-এ আক্রান্ত একজন মহিলা রোগী তার জীবন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন এভাবে। "আমার প্রথম সন্তান হওয়ার সময়ের কথা বলছি। প্রসব ব্যথা উঠলে আমি একটি ক্লিনিকে ভর্তি হই। কর্তব্যরত ডাক্তার নার্সকে জানাই যে আমি এইচআইভি পজিটিভ। তারা ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করেন। কর্তৃপক্ষ আমার সন্তান যেখানে ডেলিভারী করাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তীব্র প্রসব ব্যথাসহ আমাকে অন্য আরেকটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। বলাই বাহুল্য প্রথম বার কৃত ভুলটি আমি আর দ্বিতীয়বার করিনি। অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লিনিকে তিনি তার এইচ আই ভি পজিটিভ হওয়ার বিষয়টি চেপে যান। ফলাফল কি হতে পারে পাঠকের বোধগম্য হওয়া কঠিন কিছু নয়। এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার প্রধান পথটি হলো রক্তের মাধ্যমে। অথচ 'Universal precaution' বিষয়ে যদি আমাদের সব স্বাস্থ্যকর্মীর জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকত, তাহলে প্রথম ক্লিনিকেই সতর্কতা মেনে ভদ্রমহিলার সন্তান প্রসবের কাজটি সম্পন্ন করলে নবজাতক শিশু, স্বাস্থ্যকর্মীগনসহ সকলেই নির্ভার থাকতেন। এখানেই সমন্বয় প্রয়োজন। দক্ষ স্বাস্থ্য জনবল ছাড়া টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

সত্যিকারের জ্ঞান আমাদের সবার কাছেই আসে, যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের জীবন, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সম্পর্কে কত কম জানি।

- সক্রেটিস

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার

ছোট্ট শিশুটির একটা চোখ ভেজা কাপড় দিয়ে ঢাকা। পাঁচ বছর বয়সী তসলিমার বাম চোখে নিরাময়ের সম্ভাবনাহীন ক্যান্সার, রেটিনেব্লাস্টোমা। রোহিঙ্গা রিফ্যুজিদের জন্য নির্মিত কুতুপালং ক্যাম্পে একটি নামজাদা হাসপাতালের বিছানায় সে শুয়ে। উপস্থিত বিদেশি চিকিৎসকসহ বাবা-মা কে প্যালিয়েটিভ কেয়ার টিম তছলিমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলে। কিন্তু দুই দিন পরে আমরা জানতে পারি শিশুটিকে চিটাগাং মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে। সেই দিনেই চিটাগাং মেডিকেল কলেজে যাওয়ার পথে শিশুটির ৭ বছর বয়সি বড় ভাই রাসেল সড়ক দুর্ঘটনা আক্রান্ত হয় এবং ৭ দিন পরে তছলিমার মৃত্যু হয়। তাহলে অহেতুক রেফারেল, রাসেলের সড়ক দুর্ঘটনা এবং পরিবারের অনর্থক খরচ রোধ করা যেত যদি প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে চিকিৎসা সেবা ও বাবা-মার সঠিক ধারনা থাকত। তাই সবার জানা দরকার। সবাই জানতে পারে। সবার পক্ষেই এই সেবা দেয়া সম্ভব। শুধু দরকার একটু সচেতনতা।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে এককভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণা হচ্ছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ) প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা পাবে। চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কেউ আর্থিক অনটনে পড়বে না বা নিঃস্ব হবে না। আর সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে না।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি মানবাধিকার। আলমা আটা ঘোষণায় ২০০০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তবে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানুষের সেবা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল দরকার।

২০১৪ সালে চিকিৎসা সাময়িকী দি ল্যানসেট ১১টি দেশের ইউএইচসি অর্জন পরিস্থিতি নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। 'মুভিং টুওয়ার্ডস ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ: লেসনস ফরম ১১ কান্ট্রি স্টাডিজ' শীর্ষক ওই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এই উদ্যোগ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বাজেট

বরাদ্দ নেই। এ উদ্যোগে বড় বাধা স্বাস্থ্য খাতের অদক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য জনবলের (চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান) ৯৪ শতাংশই অদক্ষ। স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে ধরে রাখা কঠিন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর সাড়ে ৫২ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ছে। আর বড় ধরনের আকস্মিক স্বাস্থ্য ব্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে সোয়া দুই কোটি মানুষ। স্বাস্থ্য ব্যয়ে ব্যক্তির নিজস্ব অংশ বেশি হলে তা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের পথে একটি বড় বাধা।

২০১২ সালে স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তির নিজের পকেট হতে ব্যয় ছিল ৬০ শতাংশ। ২০৩২ সালে তা কমিয়ে ৩২ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তব পরিস্থিতি হয়েছে ভিন্ন। ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় কমেনি। বর্তমানে স্বাস্থ্য খাতের মোট ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ ব্যক্তি নিজের পকেট থেকে বহন করে। অর্থাৎ নিজের পকেট থেকে খরচ আরও বেড়েছে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিঃস্বায়ন বা দরিদ্র হয়ে পড়া ও আকস্মিক স্বাস্থ্য ব্যয়- এই দুটি বিষয় দিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা পরিমাপ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা সূত্রে জানা যায় বাংলাদেশের ৩ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ বা সাড়ে ৫২ লাখ মানুষ প্রতিবছর নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে শুধু চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে। অন্যদিকে পারিবারিক ব্যয়ের ১০ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্য ব্যয়ই হচ্ছে আকস্মিক স্বাস্থ্য ব্যয়। বাংলাদেশের ১৪ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ প্রতিবছর এর মুখোমুখি হচ্ছে। এদের মোট সংখ্যা ২ কোটি ২৪ লাখ।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য আছে। বৈষম্য আছে শহরে ও নগরে, আছে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণিতে। শহরের মানুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের মানুষের চেয়ে বেশি পায়। শহর-গ্রাম যেখানেই হোক, দরিদ্র মানুষ স্বাস্থ্যসেবা কম পায়।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অস্বস্তিকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি, ক্ষোভ এবং চিকিৎসা সেবার প্রতি অনাস্থা বেড়ে যাওয়া নতুন কোন ব্যাপর নয়। পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে কয়েকটি হলঃ ডাক্তার কথা ঠিক মতো শোনে না, গাদা গাদা ওষুধ লিখে দেয়, রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বুঝিয়ে বলে না; বরং অনেক সময় ধমক দেয়। আসলে একথাগুলো মিথ্যে নয়। আমরা যদি এগুলো দূর করতে না পারি, তাহলে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। একা বা কোন গোষ্ঠীর পক্ষে এটা সম্ভব হবে না।

বৈষম্য আছে রোগটির আরোগ্য সম্ভাবনা থাকা না থাকার উপর। একজন মানুষ জ্বর, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া চিকিৎসা নিতে পারেন উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে, কিন্তু সেই একই মানুষ তীব্র ক্যান্সার ব্যথা বা ক্যান্সার ক্ষত নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে তাকে তাৎক্ষনিকভাবে মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। অথচ ক্যান্সার ব্যথা বা কান্সার ক্ষতের পরিচর্যার সুবিধা উপজেলা পর্যায়ে পাওয়া দরকার, কিন্তু পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে ৭০ শতাংশ ক্যান্সার রোগী তীব্র ব্যথায় অপিওয়েড জাতীয় ঔষধ পাচ্ছে না, আমাদের সমাজে এর কারণ বহুবিধ। সবচেয়ে বড় কারণ, সচেতনতার অভাব। তীব্র ব্যথায় রোহিঙ্গা শিবিরে নুরবানুকে ব্যথার ঔষধের প্রেসক্রিপশন দেওয়া বা ঔষধ প্রাপ্তির বিশেষ গুরুত্বের কথা বলাই বাহুল্য, সাধারণভাবে ব্যথার চিকিৎসার বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতা চিকিৎসাবিদ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম। মরফিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার নিয়ে কুসংস্কারও আছে। তাদের ধারণা এই জাতীয় ঔষধ শুধু মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে দেয়া হয়। পরিসংখ্যান বলছে, ধনী পরিবারগুলোর মধ্যেও মরফিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের হার বেশ কম, যার কারণও মূলত সচেতনতার অভাব। সুতরাং সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

মেডিকেল কলেজে গেলেও রোগীর একটি বা দুটি বক্তব্য শোনার পর পরই চিকিৎসক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন) তাকে একগাদা পরীক্ষা-নীরিক্ষার নাম লিখে দেন। এখানে রোগী বা পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টি আসলে দেখার দাযিত্ব কার ? বিরামহীন রোগে আক্রান্ত মানুষের আকস্মিক স্বাস্থ্য ব্যয় কমাতে হলে দরকার একটি নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা যাতে তিনি ও তার পরিবার ২৪ ঘন্টার যে কোন সময়ে সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যেন নিয়মিত একটি সেবাদল রোগীর বাসায় গিয়ে তার বিভিন্ন কষ্টের সুরাহা করার পদক্ষেপ নেন। এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কষ্টগুলোর জন্য তাদের প্রস্তুত করতে পারে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার গৃহসেবার মাধ্যমে ঠিক এই কাজটিই করে থাকে।

শুধু ক্যান্সার কেন বলি ? মমতাময় নারায়নগঞ্জ যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড হসপি্স ও প্যালিয়েটিভ কেয়ারের' যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি প্রোজেক্ট যা নারয়নগঞ্জে প্যালিটেিভ কেয়ার সেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে ২০১৮ সালের মে মাসে শুরু হয়েছে। সেখানে একজন রোগী

এলেন যিনি সরকারী চাকুরীতে মাস্টাররোলে কাজ করেন। ৪০ বছর বয়সের এই মানুষটি ছয়মাস ধরে যক্ষার ওষুধ খাচ্ছেন। আমাদের বহিঃবিভাগে এসেছেন চর্মরোগ নিয়ে। তীব্র চুলকানি সমস্ত শরীরে, কান এবং মাথাসহ। তিনি রাতে ঘুমাতে পারেন না চুলকানোর তীব্র তাড়নায়, সারাটা দিন পার করেন দুঃসহ অস্থিরতায় কারো সামনে চুলকাতে পারেন না কি মনে করবে তাই ভেবে। তার পুরো ইতিহাস নিয়ে জানলাম তিনি শুধু যক্ষার ঔষধগুলো জেলা হাসপাতাল থেকে পাচ্ছেন। কিন্তু এই ওষুধগুলো খেলে সাথে কিছু ভিটামিন বড়ি খাওয়া অত্যন্ত জরুরী। যাই হোক তাকে ওষুধ দিলে আমতা আমতা করে বল্লেন কেনার পয়সা নাই। তার বেতন ভালোই মাসে চৌদ্দ হাজার টাকার মতো পেয়ে থাকেন। কিন্তু গত সাত মাস ধরে তিনি বেতন পাচ্ছেন না। ফলে গৃহবধু স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে প্রচন্ড দুর্দশার মধ্যে আছেন তিনি। তাই লোক মুখে আমাদের প্রজেক্টের কথা শুনে এসেছেন এখানে, যদি কেউ আসলেই মমতার হাত বাড়ায়। এক মাস পরে তিনি এলেন ফলো-আপ ভিজিটে। আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। আমূল পরিবর্তন। চর্মরোগ একেবারে নাই। পরিচ্ছন্ন ত্বক। সেই সাথে লাজুক মুখে নিচের দিকে তাকিয়ে আরেকটি আর্তি জানালেন। জেনারেল হাসপাতাল থেকে বুকের একটি এক্সরে করতে দিয়েছে। চিকিৎসক তাকে বলেছেন পরীক্ষার উপর নির্ভর করবে তার যক্ষার ঔষধ কি চলবে না বন্ধ করা যাবে। আর পরীক্ষাটি ভাল একটি সেন্টারে করাতে ৪০০ টাকা লাগবে। যদিও একমাস আগে এ পরীক্ষাটি করতে দেয়া হয়েছে, টাকার অভাবে তিনি করতে পারেন নি।

তার মানে রোগীর সমস্যাগুলো শুনতে হবে। চিকিৎসার ফলাফল তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। যেগুলো নিরাময়যোগ্য নয় সেগুলো রোগী বা আত্মীয়-স্বজনকে সহজ ভাষায় বলতে হবে। অনেক সময়ই এই অভাবটা ডাক্তারদের মধ্যে অনেক দেখা যায়। রেফারেল সিস্টেম চালু করা উচিত। এটা ছাড়া চিকিৎসার চাপ কমানো সম্ভব নয়।

সর্বোপরি, আমরা সাধারণ, মধ্যবিত্ত মানুষ, যাদের আগামীকালের আর্থিক নিশ্চিন্ততা কম, সামাজিক সুরক্ষা নীতির অভাব প্রতি পদে যারা অনুভব করেন, পরিবারের নিরাময়হীন রোগে আক্রান্ত সদস্যের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে যারা সদা শঙ্কিত, স্বাস্থ্যজনিত আকস্মিক খরচ মেটাতে গিয়ে যারা ক্লান্ত তাদের জন্য উৎসাহ, প্রেরণা এবং দিকনির্দেশনা এই তিনের সমন্বয়ে বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কর্মকৌশল ঠিক করা কি জরুরী নয়?

জীবন এবং মৃত্যু এক, যেমন নদী আর সাগর এক।

- খলিল জিবরান

মৃত্যু নিয়ে কিছু কথা

মৃত্যু কি?

মৃত্যুর দুটি সংজ্ঞা রয়েছে। প্রথাগত একটি সংজ্ঞা হলো কোনো ধরনের লাইফসাপোর্টে না থাকা ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাসযন্ত্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া। অপর স্নায়বিক সংজ্ঞা হলো 'মস্তিষ্কের মৃত্যু'। এর মানে মস্তিষ্কের সব ধরনের কাজ স্থায়ীভাবে স্থগিত হয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে।

মৃত্যুকালীন সময়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ঃ

আসন্ন মৃত্যুকালীন সময়, মৃত্যু, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিয়োগব্যথা ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বা পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয় না। বরং এগুলো একটি দেশ, জাতী, ধর্ম এবং সামাজিকতার ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে মানুষের আত্মিক সচেতনতাকে তুলে ধরে। মৃত্যু দ্বারা শুধুমাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি বুঝায় না বরং এর দ্বারা বুঝায় আত্মার অবস্থার পরিবর্তন। অন্যকথায় এসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ সবসময়ই বৃহত্তর জীবনের অর্থ খোঁজে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার মৃত্যুকে এগিয়ে আনা বা দীর্ঘায়িত করা কোনটি সমর্থন করে না। এটি মৃত্যুকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার পাওয়ার যোগ্য রোগীদের সাধারণত জীবন-সংশয়ী কোন রোগ থাকে, যেমনঃ ক্যান্সার, এইচ আই ভি/এইডস ইত্যাদি। সুতরাং মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুতিকালিন একটি সময় থাকে। মৃত্যু জীবনের অংশ। অন্তিম কালে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মুল উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু পেতে উৎসাহিত করা। মৃত্যুকালীন সময়ে রোগীর ব্যথা বা অন্যান্য উপসর্গের যথাযথ নিরসন করা। মৃতুকালীন ও বিয়োগান্তক প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান নির্দিষ্ট সামাজিক রীতি মেনে দেয়াটা নিতান্ত জরুরী।

মানুষ কিভাবে মারা যায়?

সাধারণত রোগী ও পরিবারের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে একটি অজানা ভীতি থাকে। আর যেকোন ভয় দূর করতেই সেটি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানতে চেষ্টা করা উচিত। আর তাই মৃত্যু সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য এখন জানব।

মানুষ মুলত চার ভাবে মারা যায়ঃ

পথ ১। হঠাৎ মৃত্যুঃ সড়ক দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবে মৃত্যু, হার্ট এট্যাক ইত্যাদি।

পথ ২। শারীরিক চরম খারাপ অবস্থাটি কম সময়ের হয়। যেমন - ক্যান্সার ।

এক্ষেত্রে শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে মোটামুটি সঠিকভাবে ভবিষ্যতবাণী করা যায়, যা হতে পারে সপ্তাহ, মাস বা বছর। সাধারণত ক্যান্সার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গেলে শুরু হয় শারীরিক অধোগতি। সম্ভাব্য কার্যক্ষমতা কমতে থাকা রোগের গতিপথ নির্দেশ করে থাকে যা সাহায্য করতে পারে ভবিষ্যৎ সেবার ধরণ নির্ধারণ করতে। এটি আরও সাহায্য করতে পারে সংশ্লিষ্ট সকলকে যুক্তিসহ চিন্তা করতে। রোগের চিকিৎসার ধরণ আরোগ্য-নির্ভর হবে না উপশম-নির্ভর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেকটা সহজ হয়ে দাড়ায়। সব ক্যান্সার নির্দিষ্ট পথে চলে না (যেমন, প্রোস্টেট বা ব্রেস্ট ক্যান্সার), অন্যদিকে ক্যন্সার না এমন কিছু স্নায়ুরোগ (যেমন, এমায়োট্রোফিক ল্যাটারেল স্ক্লেরোসিস) এই নিয়মে চলে।

পথ ৩। দীর্ঘস্থায়ী রোগ লম্বা সময় ধরে শারীরিক সীমাবদ্ধতা তৈরি করে অথবা মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে আবার সেরে উঠে এবং হঠাৎ করেই মৃত্যু হয়।

হার্ট ফেলিউর, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের অসুখ (COPD), শেষ পর্যায়ের লিভার রোগ, এইডস ইত্যাদি এই দলে পরে। এই রোগীরা সাধারণত বহুদিন বা বহু বছর ধরে অসুস্থ থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ অবস্থার গুরুতর অবনতি হয় যাতে করে স্বাভাবিক চিকিৎসার চেয়ে অতিরিক্ত সেবার দরকার পরে। যেমন, হাসপাতালে বা ইন্টেন্সিভ কেয়ারে ভর্তির প্রয়োজন পরে। প্রতিটি সঙ্গীন ঘটনাই রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। রোগী গুরুতর অবস্থা থেকে ভালো হলেও দেখা যায় যে তিনি আগের অবস্থায় কখনো ফিরে যেতে পারেন না। মৃত্যুর সময় এক্ষেত্রে একেবারেই অনিশ্চিত। রোগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই বিপদজনক। একটি বড় গবেষণায় দেখা যায়, হার্ট ফেলিউরে আক্রান্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ

মারা গেছেন হঠাৎ করে, যাদেরকে ধারণা করা হয়েছিলো আরও অন্ততঃ ছয় মাস বাচবেন।

পথ ৪। ক্রমবর্ধমান অবনতি

নার্ভের কিছু রোগ যেমন ডিমেনশিয়া, পারকিনসন্স রোগ, শেষ পর্যায়ের মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ইত্যাদি এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। অনেক লম্বা সময় ধরে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে - ক্রমান্বয়ে অবসাদ, ওজন কমা এবং স্বাভাবিক পুষ্টির অবনতি ঘটে। অনেক রোগ একসাথে যেমন আরথ্রাইটিস, দৃষ্টিশক্তি কমা, পুরানো স্ট্রোক, হার্টের রোগ এবং ডায়াবেটিস এই গ্রুপের রোগীদের শারীরিক অবনতির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ঠিক কতদিন তা নিয়ে ভবিষ্যতবাণী করা কঠিন। সংক্রামক রোগ (যেমন নিউমোনিয়া, মূত্র সংক্রমণ (UTI), ঘা এবং হাড়ভাঙ্গা, অনেক সময় প্রান্তিক অবস্থার কারণ হতে পারে।

মুমূর্ষু রোগীর যত্নের জন্যর স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজেদের তৈরী করতে হবে এবং রোগী ও পরিবারকে পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবেঃ

স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য

১। নিজের মৃত্যুর কথা গভীরভাবে ভাবুন। একজন মুমূর্ষু রোগী, যে কিনা তার পরিচিত পরিধির সবকিছু হারানোর পথে আছে এবং তার পরিবার অচিরেই একজন মূল্যবান প্রিয়জনকে হারাতে যাচ্ছে, তাদের সমমর্মী যত্ন প্রদানের জন্য জন্য এটি আপনাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করবে।

২। রোগী ও পরিবারের সাথে সময় ব্যয় করুন। একটি দৃঢ় আস্থা পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে সময়ের দরকার। শেষ মুহূর্তে নয় আগে থেকে তাদের সম্পর্কে জানুন, যোগাযোগ গড়ে তুলুন।

৩। আপনি রোগী ও পরিবারের যত্ন নিবেন এ সম্পর্কে তাদের নিশ্চিন্ত করুন।

৪। মৃত্যুর জন্য বেশ আগে থেকে রোগী ও পরিবারকে তৈরী করুন।

৫। এ সময়ে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে তার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করুন। সমস্যা মোকাবেলার জন্য তৈরী হোন।

৬। আত্মিক চাহিদাগুলো সম্পর্কে জানুন এবং প্রদান করুন।

৭। পরিবারকে রোগীর সাথে কথা বলতে উৎসাহিত করুন।

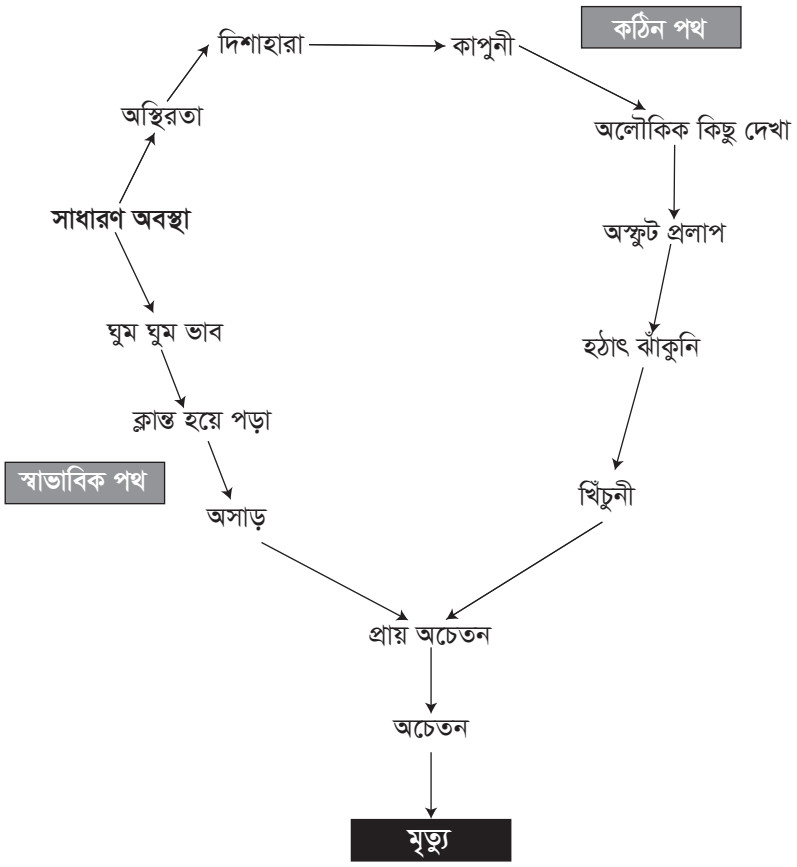
৮। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিগুলোর সাথে ভালভাবে পরিচিত হতে থাকুন শ্রদ্ধার সাথে।

৯। রোগীর প্রতি আপনার নিজের স্নেহ ভালোবাসার কথাও ভুলে যাবেন না। আপনারও বিয়োগান্তক সেবার দরকার আছে। আপনার দলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কারো সাথে তা বলতে পারেন।

(খ) রোগী ও পরিবারকে তৈরী করাঃ

তিনটি বিষয় নিয়ে পরিবার সাধারণত খুবই উদ্বেগ অনুভব করে। রোগী ঘুয়ে থাকে বা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে কিছু খেতে চায় না এবং শ্বাস নিচ্ছে কিনা বুঝা যায় না। খুব শান্তভাবে নিশ্চিত করুন যে রোগী ও পরিবার জানে যে মৃত্যু নিকটবর্তী। তাদেরকে মৃত্যুর কিছু লক্ষণ বুঝিয়ে বলতে পারেন । মৃত্যুর সাধারনত দুইট পথ পথ আছে - একটি স্বাভাবিক এবং্ একটি জটিল পথ।

মৃত্যুর পথ



- প্রিয়জনের উপস্থিতি, হাত ধরা, স্পর্শ করা, একসাথে প্রার্থনা করা রোগীকে আরাম দেয় সম্ভব হলে তা বাস্তবায়ন করুন।
- রোগীর তার পরিবারের প্রতি নির্দিষ্ট কোন অনুরোধ আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করুন।
- তাদের আবারো আশ্বস্ত করুন এবং তাদের সাথে বিধিমত প্রার্থনা করুন।
- পরিবারকে বিয়োগান্তক সেবা দেয়ার আশ্বাস দিন।

সবসময় মনে রাখবেন, প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে, যার মতামত বা সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো ক্ষমতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে তার নিজের সম্পর্কে তার স্বাধীন বক্তব্য সবচেয়ে প্রথম বিবেচনায় আনতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে তার নিজের সম্পর্কে তার স্বাধীন বক্তব্য আংশিক বিবেচনায় আনার বিধান আছে।

মৃত্যুর লক্ষণ

- ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং/অথবা দূর্বলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে।
- মৃত্যু ঘণ্টা বা মৃত্যু ঝুমঝুমি (গলায় ঘড় ঘড় শব্দ) হলে বোঝা যায় যে মৃত্যুর সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ত ৪৮ ঘন্টা বা তার কাছাকাছি।
- রক্ত চলাচল পরিবর্তনের সাথে সাথে ত্বকের রং পরিবর্তন

শক্ত/তরল খাবার

খাওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়াঃ

রোগীর ক্ষুধা এবং পানির পিপাসা কমে যায়। এটা তেমন কোন সমস্যা না, যতক্ষণ তাদের মুখ পরিষ্কার এবং ভেজা রাখা হয়। সাধারণত রোগীকে শিরাপথে স্যালাইন বা নাকে নল দিয়ে খাবার দেয়ার কোন দরকার নেই, তবে অনেক সময় পানিশূন্যতা রোধ করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগীর পরিবারকে শিখিয়ে দিতে হবে পাতলা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে এবং ঠোটে পেট্রোলিয়াম জেলী লাগিয়ে রাখতে, যাতে ঠোট না ফাটে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

- নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে পরিবর্তন
- থেমে থেমে শ্বাস-প্রশ্বাস
- সম্ভাব্য শেষ পর্যায়ের শ্বাসকষ্ট
- 'মৃত্যু ঝুমঝুমি' (Death rattle)- মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে রোগীর অচেতন অবস্থায় গলায় এক ধরণের ঘড়ঘড় শব্দ হওতে পারে। সাধারণত এটি রোগীর

জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়, তবে পরিবারের জন্য এটি খুবই পীড়াদায়ক। হাইপোফ্যারিংসে মুখের ভেতরের লালা জমা হয়। এ তরল পদার্থের উপর দিয়ে বাতাস আসা-যাওয়া করার সময় এ শব্দ হতে থাকে। সাধারণ অবস্থায় রোগী তা গিলে ফেলে বা থুতু/কাশি দিয়ে বের করে ফেলে।

ঘটনা বুঝিয়ে বলা এবং পরিবারকে আশ্বস্ত করা খুব জরুরী। কাত করে শোয়ালে অনেক সময় লালা বেরিয়ে আসে। যেভাবে শোয়ালে সবচেয়ে বেশী জমা তরল বের হয়ে আসে, সম্ভব হলে সেভাবে রাখলে ভালো হবে।

ইউথ্যানাসিয়া এবং ফিজিসিয়ান- অ্যাসিস্টেড সুইসাইড

আজ পর্যন্ত জীবনের শেষ প্রান্তের যত্নের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়টি হলো ইউথ্যানাসিয়া। এই জটিলতার কারণ হলো বিষয়টির সাথে জড়িত রয়েছে চিকিৎসা, নীতি, আইন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মের প্রশ্ন। এছাড়া ব্যক্তিগত আবেগ ও অস্তিত্বের প্রশ্নতো সরাসরি মিশে আছেই।

গ্রীক শব্দ 'EU' বা ইউ' অর্থ 'ভালো' এবং 'Thanatos' বা থ্যানাটস' মানে 'মৃত্যু'। ইউথ্যানাসিয়া শব্দটির এর শাব্দিক অর্থ হলো 'একটি ভালো মৃত্যু'। তবে এর বিভিন্ন সংজ্ঞা কিন্তু অন্য কথা বলে। যেমন, ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েসন অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলে, "একজন মানুষের স্বেচ্ছাকৃত এবং সক্ষম অনুরোধের ফলে, একজন চিকিৎসক যখন পরিকল্পিতভাবে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে হত্যা করে।" নেদারল্যান্ডের আইনে বলা হয়, "একজন রোগীর পরিষ্কারভাবে প্রকাশকৃত ইচ্ছাপূরণের জন্য একজন চিকিৎসক যখন ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত রোগীর জীবন শেষ করে, তাকেই ইউথানাসিয়া বলা হয়"

ফিজিসিয়ান- অ্যাসিস্টেড সুইসাইড-এর সংজ্ঞায় বলা হয়, "ডাক্তার যখন ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মানুষের স্বেচ্ছাকৃত এবং সক্ষম অনুরোধে একজন মানুষকে আত্মহত্যা করতে সাহায্য করে, ঔষধ প্রদান করে যা মানুষটি নিজে গ্রহণ করবে"। নেদারল্যান্ডে সংজ্ঞায়িত করা হয় একটু ভিন্নভাবে, "রোগীর পরিষ্কারভাবে প্রকাশকৃত তার জীবনাবসানের ইচ্ছা পূরণের জন্য একজন চিকিৎসক যখন রোগীর ব্যক্ত অনুরোধে তাকে প্রেসক্রিপশন অথবা ঔষধ সরবরাহ করে।" দুটোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো কার মাধ্যমে রোগী ঔষধ গ্রহণ করছে। ইউথ্যানাসিয়া আইনি অধিকার প্রদান করে এমন দেশগুলো হচ্ছেঃ নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, এবং কলম্বিয়া। সুইজারল্যান্ড, জাপান, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র- ওরিগন, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া কলোরাডো, ভারমন্ট এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিজিসিয়ান- অ্যাসিস্টেড সুইসাইড আইনগত অধিকার।

লেখক পরিচিতি

ডাঃ ফারজানা খান পেশায় একজন চিকিৎসক। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৯৪ সালে। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি হতে পাবলিক হেলথ্ এবং ২০১৪ সালে ল্যানকাস্টার ইউনিভার্সিটি হতে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

২০১৫ সালে তিনি 'ফসিউদ্দীন খান রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (এফকেআরএফ) নামে অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। মূলত প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ে গবেষণা এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অরক্ষিত শ্রেণীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি এফকেআরএফ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জীবন-সংশয়ী ও জীবন সীমিতকারী রোগে আক্রান্ত মানুষদের সেবা দিচ্ছে। উল্লেখ্য এফকেআরএফ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একমাত্র প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।